"Islam At The Crossroads" গ্রন্থের অনুবাদ

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত

মুহাম্মাদ আসাদ রহ.

CAPITALISM COMMUNISM NATIONALISM SECULARISM ISLAM

জাকারিয়া মাসুদ
অনূদিত

মূলত হীনমন্যতার কারণেই ফিরিঙ্গি সভ্যতার অনুকরণের প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। যেসব মুসলিমরা পশ্চিমাদের অনুসরণ করে, তার পেছনেও এটাই কারণ। পশ্চিমাদের ক্ষমতার দাপট, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও ধবধবে চেহারার সাথে তারা দুর্দশাগ্রস্ত ইসলামি বিশ্বের তুলনা করে। আর বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, এই জমানায় পশ্চিমাদের দেখানো পথ ছাড়া (উন্নতির) আর কোনো রাস্তা নেই। নিজেদের অক্ষমতার জন্যে ইসলামকে দায়ী করাটা আজ আমাদের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে...

মুসলিম-বিশ্বের পুনর্জাগরণের জন্যে কোনো ধরনের বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে, নিজেদের দ্বীন ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে কাঁচুমাচু করার মানসিকতা একদম ঝেড়ে ফেলতে হবে। মুসলিমকে অবশ্যই মাথা উঁচু বাঁচতে শিখতে হবে। তাকে বুঝতে হবে, পুরো দুনিয়ার চেয়ে সে আলাদা। তার উচিত এই স্বকীয়তা নিয়ে গর্ব অনুভব করা। অন্ধের যষ্ঠি মনে করে একে আগলে রাখতে হবে। এই ব্যাপারে কোনো প্রকার দোনোমনো করা চলবে না। অন্য কোনো সংস্কৃতির সাথে না গুলিয়ে, একে বীরের মতো তুলে ধরতে হবে বিশ্ববাসীর সামনে।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

মোহাম্মাদ আসাদ

ভাষান্তর

জাকারিয়া মাসুদ

মূল বই : Islam At The Crossroads

লেখক : মোহাম্মাদ আসাদ

অনুবাদক : জাকারিয়া মাসুদ

নিরীক্ষক : শফিউদ্দীন চৌধুরী

প্রচ্ছদ : শাহরিয়ার হোসাইন

পৃষ্ঠাসজ্জা : জাকারিয়া মাসুদ

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

একদিকে জীবনের প্রথম অনুবাদ, অপরদিকে খটমটে তাত্ত্বিক বই। আমার যেন দাঁত ভাঙার উপক্রম। তবুও ভাঙাভাঙি ছাড়াই যে কাজটা শেষ করতে পেরেছি, সেজন্যে মহান আল্লাহর শুকরিয়া। আলহামদু-লিল্লাহ।

পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে কিছু পাদটীকা যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইন-শা-আল্লাহ, এর মাধ্যমে লেখকের কথাগুলো আরও ভালোভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। লেখক যেসব পাদটীকা যোগ করেছিলেন, সেগুলো উল্লেখ করার সময় 'লেখক কর্তৃক সংযোজিত'—এই কথাটুকু বলে দেওয়া হয়েছে।

ভালোবাসা রইল শফিউদ্দীনের প্রতি। ছেলেটি আমাকে অনেক সহায়তা করেছে। বয়সে ছোট হলেও, জ্ঞানের দিক থেকে সে আমার চেয়ে অনেক বড়। তার সহায়তা না পেলে বইটি হয়তো আলোর মুখ দেখত না।

অনেক রাত জেগে, অনেক মেহনত করে অনুবাদটি শেষ করতে হয়েছে। তর্জমা নির্ভুল রাখার ব্যাপারে চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু মানুষ মাত্রই ভুল। তাই সতর্ক থাকার পরেও অনুবাদে ভুল থেকেই যেতে পারে। আপনাদের নজরে যদি কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়ে, তবে অবশ্যই জানাবেন। ভুল শুধরে নিতে কোনো কার্পণ্য করব না ইন-শা-আল্লাহ।

আপনাদের ভাই,

জাকারিয়া মাসুদ

৩ রজব, ১৪৪৩ হিজরি

jakariamasud2016@gmail.com

বইটি লেখা হয়েছিল প্রায় অর্ধশত বছর আগে। ১৯৩৩ সালের শরৎকালে। এটা প্রকাশিত হয়েছিল দিল্লি থেকে, ১৯৩৪ সালে। পরবর্তী সময়ে এটি লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। বইটি রচিত হয়েছিল সমসাময়িক মুসলিম-প্রজন্মকে পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধের অন্ধ অনুকরণ থেকে বিরত থাকার আর্জি নিয়ে। এবং পূর্বসূরিদের থেকে পাওয়া ইসলামি ঐতিহ্য (অর্থাৎ মুসলিম সভ্যতাকে) সংরক্ষণ করার দাবি নিয়ে, যা একসময় তাদেরকে করেছিল মহিমান্বিত। 'মুসলিম সভ্যতা' শব্দটির সাথে জড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক নানান ঘটনাপ্রবাহ।

আমার প্রথম ইসলামি সাহিত্যকর্ম অবিভক্ত ভারতের ইংরেজি-ভাষী মুসলিমদের মধ্যে তাৎক্ষণিক ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এটি পুনঃমুদ্রিত হয়েছিল বহুবার। কয়েক বছর পর এটি অনূদিত হয় আরবিতে। তখন এর প্রভাব পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ওপর। এমনকি ইংরেজি ভাষায় লেখা মূল পাণ্ডুলিপিকেও এটি ছাপিয়ে যায়।

এর ইতিবাচক ফলাফল ত্বরিত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম লেখকদের কিতাবাদিতে। *Islam at the Crossroads* বইটার সার্মর্মকে তারা নানা দিক থেকে এবং নানান আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেন। এ-সবই ছিল তাদের আপন মনের খেয়াল। কখনো কখনো ওগুলো আমার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে যেত। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের মতামত আমার উপসংহার এবং মূল বক্তব্যের ধারেকাছেও ঘেঁষত না। এখন মনে হচ্ছে, তারা আমার চিত্রকল্পের ঠিক উল্টোটা বুঝেছিলেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মুসলিমরা-যে ক্ষমতাধর পশ্চিমা সভ্যতার চেয়ে আলাদা, এই সচেতনতা পুনরায় জাগ্রত করার সাধ বইটি লেখার সময় আমার অন্তরে জেগেছিল। যাতে করে ইসলাম নিয়ে গর্ববোধ করার বাসনা, মুসলিমদের অন্তরে গেঁথে যায় এবং তারা একে আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ হয়। নিজেদের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠান, (ইসলাম ও পশ্চিমের) এই আবশ্যিক বিভাজন জিইয়ে রাখতে সাহায্য করবে। এবং শত শত বছর ধরে চলে আসা মুসলিম জাতিসত্তার চরম স্থবিরতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্বকে ডিঙিয়ে পুনরায় সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমাদেরকে করে তুলবে কর্মমুখর।

বইটির সারকথা ছিল—'পুনর্জাগরণ' এবং 'সংরক্ষণ'। বলাই বাহুল্য, 'সংরক্ষণ' করতে হবে পূর্ববর্তীদের ওই সব রীতিনীতি এবং মূল্যবোধ, যেগুলো সংস্কৃতির যোগানদাতা হিসেবে ইসলামের বাস্তবতা প্রমাণের জন্যে বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। আর 'পুনর্জাগরণ'-টা হবে ইসলামি আদর্শ-মণ্ডিত চিন্তাধারার, যেভাবে কুরআন ও নবিজির সুন্নাহ'য় বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু কী কাণ্ডটাই না হলো! যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বইটি লিখেছিলাম, পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু মুসলিম পাঠক ও নেতৃবৃন্দ তার উল্টোটা বুঝে নিলেন। সাংস্কৃতিক কর্মকুশলতার দিকে আমার আহ্বানের নিগূঢ় অর্থ বুঝতে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। তারা এটা ভেবে বসেছেন যে, বিগত শতাব্দী ছিল মুসলিমদের অবক্ষয়-কাল। তো সেই সময়কার সমাজ-কাঠামোতে ফিরে গেলে কীই-বা হবে!

ইতিমধ্যেই আমি বলেছি, এগুলো হলো আমার চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলিম-বিশ্বে পুনর্জাগরণ হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এটা কুরআন-সুন্নাহর সত্যিকার মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ নয়। এটা হলো একধরনের বিভ্রান্তি। কুরআন-সুন্নাহর মতো ইসলামের হক্কানি উৎসগুলোতে যে আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায়, নির্ভয়ে তার দিকে ফিরে না এসে, মধ্যযুগে মুসলিম-বিশ্বে বিদ্যমান সামাজিক রীতিনীতি এবং চিন্তাধারাকে অন্ধভাবে হুটহাট মেনে নেওয়ার ফলেই এর উৎপত্তি ঘটেছে।

বইটি বর্তমান মুসলিম-বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া মর্মান্তিক ভ্রান্তিকে খানিকটা তুলে

করার প্রয়াস মাত্র। আমি বইটির পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ আপনাদের সামনে পেশ করছি এই আশায়, হয়তো এটি বর্তমান জমানার মুসলিম তরুণদের উপকারে আসবে। যেভাবে ১৯৩৪ সালের সংস্করণ ওই সময়কার তরুণদের উজ্জীবিত করেছিল—যাদের অনেকেই আজ এই প্রজন্মের বাবা কিংবা দাদা। যদি তাদের পূর্বপুরুষরা আমার বক্তব্যকে ভুল বুঝেও থাকে, হয়তো-বা অর্ধশত বছর আগে উদ্ভাসিত সেই আলোয় ইদানীংকালের তরুণ মুসলিমগণ আরও ভালো করে এর ভাবার্থ বুঝতে সক্ষম হবে। সামনে তাদেরকে যে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে, বইটি হোক তার পাথেয়।

মুহাম্মাদ আসাদ

মরক্কো, ১৯৮২
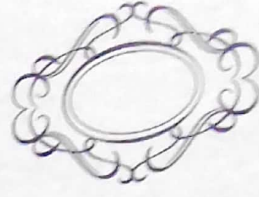
বইটি কেন লিখলাম?

বর্তমান সময়ের মতো মানুষ আর কখনোই এতটা বুদ্ধিবৃত্তিক অস্থিরতার সম্মুখীন হয়নি। আমরা কেবল এমন সমস্যার মুখোমুখিই হচ্ছি না, যার জন্যে নিত্যনতুন ও অভিনব সমাধান প্রয়োজন। পাশাপাশি এসব সমস্যা আমাদের সামনে এমন সব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হাজির হচ্ছে, যেগুলোর সাথে আজও আমাদের পরিচয় ঘটেনি। সকল দেশের সমাজব্যবস্থায় সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। যে গতিতে এই পরিবর্তন হয়, অবস্থাভেদে তার তফাত ঘটে। তবে আমরা সকল জায়গায় একই ধরনের ভাবলেশহীন গতিশীলতা দেখতে পাই।

এই দিক থেকে ইসলামি জগতও ব্যতিক্রম নয়। পুরোনো রীতিনীতি ও ধ্যানধারণাগুলো ক্রমাগত বিলীন করে দিয়ে নতুনত্বের উত্থান এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই ক্রমবিকাশ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কতখানি গভীরে গিয়ে ঠেকেছে এটি? ইসলামের সাংস্কৃতিক মিশনের সাথে এটি কতটা খাপ খায়?

সামগ্রিকভাবে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া এই কিতাবের উদ্দেশ্য নয়। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে কেবল নয়া জমানার মুসলিমদের একটি সমস্যা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তা হলো, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তারা কী ধরনের মনোভাব পোষণ করবে। বিষয়টি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ, তাই ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক দিকসমূহ খতিয়ে দেখা হয়েছে। বিশেষ করে সুন্নাহর বিষয়টি। এটি এমন এক বিষয়, যার সম্পর্কে বলতে গেলে খণ্ডের-পর-খণ্ড শেষ

হয়ে যাবে। তাই যৎসামান্য ধারণা দেওয়া ছাড়া এখানে আর কিছু বলা সম্ভব হয়ে উঠবে না। এরপরও আমি কিছুটা আত্মবিশ্বাসী যে, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি নিয়ে হয়তো অন্যদের উদ্যোগী হতে সাহায্য করবে।

এখন আমি নিজের পরিচয় দিচ্ছি। কারণ, (ইসলামে) প্রত্যাবর্তনকারী একজন ব্যক্তি যখন মুসলিমদের সাথে কথা বলবে, তখন 'কিভাবে' আর 'কেন' সে ইসলাম গ্রহণ করেছে—এটা জানার অধিকার তাদের আছে।

১৯২২ সালে আমি আমার জন্মস্থান অস্ট্রিয়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। উদ্দেশ্য ছিল, কিছু বিখ্যাত মহাদেশীয় পত্রিকার বিশেষ সাংবাদিক হিসেবে এশিয়া ও আফ্রিকা সফর করা। তারপর থেকে আজ অবধি, আমি আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি ইসলামি প্রাচ্যে। আমি যেসব জাতির সংস্পর্শে এসেছিলাম, প্রথম দিকে স্রেফ একজন ভিনদেশী হিসেবে তাদের ব্যাপারে (জানার) আগ্রহবোধ করতাম। আমি তখন এমন এক সমাজব্যবস্থা ও জীবনবোধ দেখতে পেলাম, যা একেবারেই ইউরোপীয়দের বিপরীত। ঠিক এ কারণেই প্রথম থেকে আমার মধ্যে ইউরোপের হঠকারী ও যান্ত্রিক জীবনের তুলনায় শান্ত কিংবা বলা উচিত মানবিক জীবনবোধের প্রতি অনুরাগ জেগে ওঠে। এই অনুরাগ আমাকে এমনতরো পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়। আর আমি মুসলিমদের দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ি।

সে-সময় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার দৃঢ় আগ্রহ আমার মধ্যে ততটা ছিল না। কিন্তু এটি আমার সামনে এমন এক অগ্রগামী মানব-সমাজের চিত্র তুলে ধরে, যার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি। আর অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ (যার মধ্যে) খুবই সামান্য। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছে—বর্তমান মুসলিমদের জীবন, ইসলামের বাতলে দেওয়া ধর্মীয় আদর্শ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। ইসলামের অগ্রযাত্রা ও বিপ্লবী চেতনা পাল্টে দিয়ে, মুসলিমরা অলস ও কর্মবিমুখ জীবন (বেছে নিয়েছে)। ইসলামের উদারতা ও কুরবানির মানসিকতা বিকৃত করে, মুসলিমরা আয়েশী জীবন এবং সংকীর্ণ মানসিকতার দিকে (ঝুঁকে পড়েছে)।

এটি আবিষ্কার করার পর আমার উৎসাহ বাড়ল ঠিক, কিন্তু অবাক হলাম ইসলামের অতীত ও বর্তমানের ফারাক দেখে। তাই আমার সামনে আসা সমস্যাটিকে আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। মানে, আমি নিজেকে ইসলামের ছায়াতলে কল্পনা করতে লাগলাম। এটি ছিল পুরোপুরি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সঠিক দিশা খুঁজে পেলাম। বুঝতে পারলাম, মুসলিমদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ হলো, তারা আত্মিকভাবে ধীরে ধীরে ইসলামি শিক্ষার অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছে। ইসলামে সেখানে আছে ঠিক, কিন্তু সেটা যেন আত্মাহীন এক দেহের মতো। যে উপাদানটি একসময় পুরো মুসলিম উম্মাহকে শক্তি জুগিয়েছিল, আজ সেটাই তার দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোড়ার দিক থেকেই ইসলামি সমাজব্যবস্থার একমাত্র ভিত্তি ছিল দ্বীন। আর এই ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার কারণেই আজকে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক কাঠামো দুর্বল হয়ে গিয়েছে। হয়তো এর জন্যেই ইসলামি সংস্কৃতি দিনে দিনে ম্লান হয়ে যাবে।

আমি যতই ইসলামি শিক্ষার বাস্তবতা ও এর প্রায়োগিক দিকটা অনুধাবন করতে পারছিলাম, ততই আমার মধ্যে প্রশ্ন জেগে উঠছিল—কেন মুসলিমরা তাদের জীবনে দ্বীনের পরিপূর্ণ চর্চা ছেড়ে দিয়েছে।

লিবিয়ান মরুভূমি ও পামিরস অঞ্চল, বসফরাস ও আরব সাগরের মাঝে অবস্থিত দেশসমূহের বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করি। এটি আমার জন্যে রীতিমতো অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামি দুনিয়ার অন্যসব বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় সম্পর্কে আমার আগ্রহকে ছাপিয়ে যায়। আমার জিজ্ঞাসাবাদ ধীরে ধীরে এতটাই জোরালো হয়ে দাঁড়ায় যে, মনে হচ্ছিল—একজন অমুসলিম হয়েও মুসলিমদের অবহেলা ও উদাসীনতা থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্যে আমি তাদের সাথে কথা বলছিলাম।

আমার এই অগ্রগতি নিজের কাছেই অনেকটা আড়াল থেকে যায়। ১৯২৫ সালের শরৎকালে আফগানিস্তানের পাহাড়ি অঞ্চলের এক যুবক গভর্নর আমাকে বলেন : "তুমি তো মুসলিম। কিন্তু তুমি নিজেই তা জানো না।" তার কথায় আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম এবং নিশ্চুপ থাকলাম। কিন্তু

১৯২৬ সালে পুনরায় ইউরোপে ফেরার পর বুঝতে পারলাম—আমার মনোভাবের একমাত্র যৌক্তিক ফলাফল হলো ইসলাম কবুল করা। এটাই হলো আমার ইসলাম গ্রহণের উপাখ্যান। সে-সময় থেকেই আমি বারবার নিজেকে প্রশ্ন করে আসছি, "কেন তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে? কোন জিনিসটি বিশেষভাবে তোমাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল?"

এটা স্বীকার করতেই হবে, এই প্রশ্নের জুতসই কোনো উত্তর আমার কাছে নেই। আসলে বিশেষ কোনো শিক্ষা আমাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেনি। বরং ইসলামের আকর্ষণীয় ও বর্ণনাতীত সুসঙ্গত নৈতিক শিক্ষা এবং বাস্তবসম্মত জীবনাচার আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আমি এখনো বলতে পারব না, এর মধ্যে কোন জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে।

ইসলামকে আমার কাছে নিখুঁত স্থাপত্যকলার মতো মনে হয়। এর প্রত্যেকটি অংশ এতটাই সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পিত যে, একটি অন্যটির পরিপূরক ও অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। এখানে কোনো বাড়াবাড়ি নেই, আবার ছাড়াছাড়িও নেই। এর ফলে এটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থির জীবনব্যবস্থায় রূপ নিয়েছে। ইসলামের প্রত্যেকটি শিক্ষা ও মৌলিক নীতি 'যথাযথ অবস্থানে রয়েছে'—খুব সম্ভবত এই অনুভূতিই আমার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। এর সাথে আরও কিছু প্রভাব হয়তো দায়ী ছিল, যা এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করা কঠিন। সর্বোপরি এর সাথে ভালোবাসার ব্যাপারটিও জড়িত ছিল। আর ভালোবাসা তো নানাভাবেই জন্মাতে পারে। আশা-আকাঙ্ক্ষা ও একাকীত্ব থেকে, উচ্চাশা ও অক্ষমতা থেকে, দৃঢ়তা ও দুর্বলতা থেকে ভালোবাসার জন্ম হয়। আমার ক্ষেত্রে হয়তো এমনটাই ঘটেছিল। ইসলাম আমার কাছে এসেছিল ডাকাতের বেশে, যে কিনা রাতের বেলায় মানুষের ঘরে ঢুকে। কিন্তু ডাকুর মতো **(ধন-সম্পদ লুট না করে)** লুটে নিয়ে যায় অন্তর।[১]

তখন থেকেই আমি আমার সাধ্যের সর্বোচ্চটা দিয়ে ইসলামকে বোঝার

[১] শাব্দিক অনুবাদ হবে : "যে কিনা রাতের বেলায় মানুষের ঘরে ঢুকে। কিন্তু ডাকাতের মতো আচরণ না করে, চিরকাল থেকে যাওয়ার জন্যে আসে।"

চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি কুরআন-হাদীস নিয়ে পড়াশোনা করলাম। এর ভাষা ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করলাম। এর পক্ষে-বিপক্ষে যা কিছু লেখা হয়েছে, সে-সম্পর্কে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম প্রচুর। হিজায ও নজদ এলাকায় প্রায় নয়টা বছর পার করেছি আমি। বেশিরভাগ সময় কেটেছে মক্কা ও মদীনায়। যাতে করে মুহাম্মাদে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে পরিবেশে এই দ্বীন প্রচার করেছিলেন, তার কিছুটা স্বাদ আমিও পেতে পারি।

হিজায বহুদেশের মুসলিমদের মিলনস্থল। যার ফলে আমি মুসলিম-বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনা করতে পেরেছিলাম। এসব গবেষণা ও তুলনা আমার মাঝে এই দৃঢ়তা সৃষ্টি করে যে, মুসলিমদের অবহেলার ফলে সৃষ্টি হওয়া নানাবিধ বিপত্তি সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম আজও এমন এক চালিকাশক্তি, যা মানবজাতি আর কখনোই প্রত্যক্ষ করেনি। সেই থেকে আমার সমস্ত আগ্রহ ইসলামের পুনর্জাগরণকে ঘিরে। এই ছোট্ট বইটি সেই মহান লক্ষ্যের পথে একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

এখানে বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যাপারে নিরঙ্কুশ পর্যবেক্ষণ জাহির করা হয়নি। আমার দৃষ্টিতে এটি 'ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা'-র ব্যাপারে আলোকপাত মাত্র। বইটি ওইসব মানুষদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি, যাদের কাছে ইসলাম হলো অন্যান্য ধর্মের মতো গড়পড়তা সামাজিক উপকরণ। বরং এটি তাদের জন্যে লেখা হয়েছে—যাদের মনে আজও ওই আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে, যা নবিজির সাহাবিদের অন্তরে ছিল। সেই আগুন, যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তুলেছিল।

মুহাম্মাদ আসাদ

দিল্লি, মার্চ, ১৯৩৪
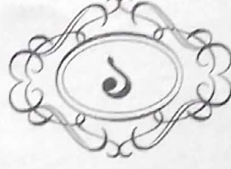
ইসলামের বাতায়ন

'মহাকাশ বিজয়'। এই স্লোগানটির মধ্য দিয়ে বর্তমান জমানার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। বোঝাই যাচ্ছে : যোগাযোগ-মাধ্যমের এতটাই উন্নতি হয়েছে যে, বিগত প্রজন্মের কাছে তা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। এসব অভিনব কর্মপন্থা সৃষ্টি করেছে ত্বরিত গতি এবং বিপুল পরিমাণ পণ্য আদান-প্রদানের (অবারিত সুযোগ)। মানব-ইতিহাসে এমনটা আর কখনোই দেখা যায়নি। এই উন্নতির ফলে অর্থনৈতিকভাবে দেশগুলো একে-অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এমন কোনো জাতি-রাষ্ট্র নেই, যারা নিজেদেরকে এর আওতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্রেফ অভ্যন্তরীণভাবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি এখন বৈশ্বিক রূপ নিয়েছে। রাজনৈতিক সীমানা এবং ভৌগলিক দূরুত্বকে পাশ কাটিয়ে চলাটাই এর নিজস্ব প্রবণতা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে শুধু ক্রমবর্ধমান চাহিদার পণ্যই নিয়ে যায় না। বরং দর্শন এবং সংস্কৃতিও নিয়ে যায় সাথে করে। এই সমস্যাটি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নীরেট বস্তুবাদী[২] দৃষ্টিভঙ্গির চাইতেও হয়তো বেশি গুরুত্ব বহন করে।

---

[২] বস্তুবাদকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটা হলো সাধারণ বস্তুবাদ, অপরটি দার্শনিক বস্তুবাদ। সাধারণ বস্তুবাদ বলতে জগৎ সম্পর্কে জনসাধারণের মতবাদকে বোঝায়।

চারিপাশের জগৎ মায়া নাকি যথার্থ, মিথ্যা নাকি সত্য—এ বিষয়ে আদিকাল থেকেই মানুষ প্রশ্ন করে আসছে। সাধারণ মানুষ যুক্তিতর্ককে পেছনে রেখে, জীবন-যাপনের প্রয়োজনে জগৎ এবং বাস্তবতাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তারা আরও গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেছেন। তাদের হাত ধরেই গড়ে উঠেছে দার্শনিক বস্তুবাদ। বস্তুবাদী দার্শনিকদের কথা হলো, বিশ্বজগৎ অবিনশ্বর এবং শাশ্বত। ঈশ্বর বা বাইরের কোনো শক্তি

অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তি–দুটো মাঝেমধ্যে একসাথে চললেও, এদের কিছু মৌলিক তফাত রয়েছে। অর্থনীতির সারকথা হলো, রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পণ্যের পারস্পরিক আদান–প্রদান থাকতে হবে। এর মানে দাঁড়ায়, একটি রাষ্ট্র স্রেফ ক্রেতা আর অন্যটি বিক্রেতা হতে পারবে না। উভয়কেই কোনো–না–কোনো মাধ্যম দিয়ে পারস্পরিক দেওয়া–নেওয়ার কাজটি দীর্ঘমেয়াদে চালিয়ে যেতে হবে। সেটা হতে পারে সরাসরি, কিংবা অর্থনৈতিক গণ্ডির মধ্যে। কিন্তু সংস্কৃতি কখনো এই দেওয়া–নেওয়া রীতির তোয়াক্কা করে না। অর্থাৎ আদান–প্রদানের যে মূলনীতি, তার নিরিখে দর্শন এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক বিনিময় হয় না। যেসব রাষ্ট্র এবং সভ্যতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বেশি শক্তিশালী, তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিকভাবে কম সক্রিয় এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয় না কখনো। বরং দুর্বলদেরই প্রভাবিত করে গভীরভাবে। এটাই মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। আজ পশ্চিমাদের সাথে মুসলিম–বিশ্বের এই ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান।[৩]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম–বিশ্বের ওপর পশ্চিমা সভ্যতার এই শক্তিশালী এবং একপেশে প্রভাব মোটেই বিস্ময়কর কিছু নয়। চাই মুসলিমরা এটা স্বীকার করুক বা না–করুক। কারণ, এটা মূলত সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল, যার সাথে অনেককিছুর যোগসাজশ রয়েছে।

মহাবিশ্বের স্রষ্টা নয়। বিশ্বের কোনো স্থানিক সীমা নেই। এটি অসীম। ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটলে, বস্তুবাদ ফুলে-ফেঁপে ওঠে। সমসাময়িক বস্তুবাদী দার্শনিকগণ ধর্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নেন। এদের মধ্যে বেকন, গ্যালিলিও, হবস, স্পিনোজা ও লকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রমান্বয়ে এর বিকাশ ঘটতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের চিন্তাধারায় এটি নতুন রূপ পায়। [সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ*, পৃ. ২৭৯; সুপ্রকাশ রায়, *পরিভাষা কোষ*, পৃ. ১২১-১২৬]

[৩] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ১ নং পাদটীকা)** : পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত আলজেরিয়ান লেখক মালিক বিন নাবি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে 'কেনা-বেচার' এই ধারণাটি এবং এই ক্ষেত্রে বর্তমান মুসলিম-বিশ্বের ওপর পড়া নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। মুসলিমরা নিজেদের সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে ইউরোপীয়ও পণ্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছে—তার বইতে সর্বপ্রথম এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিমরা পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি ও সাংগঠনিক পদ্ধতি, সেই সাথে পাশ্চাত্যের সমাজ ও রাজনৈতিক ধারণার 'ক্রেতায়' রূপান্তরিত হয়েছে। অথচ তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনার 'বিক্রেতা' হতে পারেনি। মানে, এর বদলে নিজেদের চিন্তা-চেতনার দ্বারা ইউরোপে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু ঐতিহাসিকরা স্রেফ পর্যবেক্ষণ নিয়েই ব্যস্ত। হয়তো-বা (তারা এতেই) সন্তুষ্ট! কিন্তু সাধারণ মুসলিমদের জন্যে সমস্যাটি এখনো অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছে। আমরা যারা নিছক উৎসুক দর্শক নই, বরং এই দৃশ্যের একজন বাস্তব অভিনেতা, যারা নিজেদেরকে নবি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারী দাবি করি, তাদের জন্যে সমস্যার সূত্রপাত মূলত এখানেই। আমরা বিশ্বাস করি, অন্যান্য ধর্মগুলোর মতো ইসলাম কেবল আত্মশুদ্ধির (ধারক) এবং অন্যকোনো সংস্কৃতির সাথে মানানসই দ্বীন নয়। বরং ইসলাম তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে স্বয়ংসম্পূর্ণ তমদ্দুন এবং দীপ্তিমান সমাজব্যবস্থার ধারক-বাহক।

ইদানীংকালে বহিরাগত সভ্যতা আমাদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করছে। আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। 'বহিরাগত এই প্রভাব আমাদের সংস্কৃতির পক্ষে নাকি বিপক্ষে?' 'এটা কি ইসলামি তমদ্দুনের দেহে প্রাণসঞ্চারী রক্তরস হিসেবে কাজ করবে নাকি বিষ হিসেবে?'— এগুলো পষ্ট করা এই সময়টাতে জরুরি হয়ে পড়েছে।

এই প্রশ্নের একটি উত্তর আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পেতে পারি। ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি কী, আমাদেরকে তা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর দেখতে হবে, এ-দুয়ের মাঝে কতখানি সমঝোতা সম্ভব। যেহেতু ইসলামি সভ্যতা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই মানবজীবনে ধর্মের ভূমিকা আমাদেরকে সবার আগে বুঝতে হবে।

'ধর্মীয় অনুভূতি' বলতে আমরা যা বুঝি বা বলি, তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং জৈবিক কাঠামোর একটি প্রাকৃতিক ফলাফল। জীবন ও মৃত্যুর রহস্য, অসীম ও পরকালীন জগতের রহস্য মানুষ নিজে-নিজেই উদ্ঘাটন করতে পারে না। এইসব ভাবনার ক্ষেত্রে তার সমস্ত যুক্তি এক অভেদ্য দেয়ালে এসে গেঁথে যায়। এক্ষেত্রে তার হাতে স্রেফ দুটো রাস্তা খোলা থাকে।

প্রথমত, সামগ্রিকভাবে জীবনকে বোঝার চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে সে কেবল তার অভিজ্ঞতালব্ধ বাহ্যিক জ্ঞানের ওপরেই ভরসা করবে এবং প্রাপ্ত ফল নিয়ে এর সীমার মধ্যেই ঘুরপাক খাবে। কিন্তু এর মাধ্যমে সে কেবল

সক্ষম হবে। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশকেই বুঝতে সক্ষম হবে। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের (অর্জিত) জ্ঞান অনুসারে, এর পরিমাণ ও পষ্টতা কমবেশি হতে পারে। কিন্তু তারপরেও, সেটা ওই ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। মানুষের যুক্তিবিদ্যার (সীমাবদ্ধতার কারণে) সামগ্রিকভাবে জীবনকে উপলব্ধি করার ব্যাপারটা রয়ে যাবে আড়ালেই। প্রকৃতিবিজ্ঞান মূলত এই পথ ধরেই হাঁটে।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের পাশাপাশি 'ধর্ম' হতে পারে আরেকটি চমৎকার সমাধান। এটা তার অভ্যন্তরীণ সহজাত অভিজ্ঞতার আলোকে, মানুষকে জীবনের একটি একক ব্যাখ্যা গ্রহণের পথ দেখায়। মানুষের বোধশক্তির ঊর্ধ্বে থাকা একজন মহাশক্তিধর সত্তার পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে—এই তত্ত্বের ওপরই সে জোর দেয়। বাহ্যিক পর্যবেক্ষণের জন্যে মানুষকে যা-যা দেওয়া হয়েছে তা কাজে লাগিয়ে, জীবনের ব্যাপারে এমনতরো অনুসন্ধান চালাতে ধর্ম কখনো বাধা দেয় না।

বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্বভাবগত কোনো বিরোধ নেই। বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই মানব-জীবনের মৌলিক উপাদান এবং চালিকাশক্তির যুগপৎ ধারণা আঁচ করা যায়। সংক্ষেপে একে ভারসাম্যপূর্ণ 'সমন্বয়' বলা চলে। 'সমন্বয়' পরিভাষাটিকে যদিও অপব্যবহার করা হয়েছে, তবুও এই ধরনের সংযোগের ক্ষেত্রে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি মানুষের সহজাত অভিব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

ধার্মিক ব্যক্তি জানে, তার সাথে যা কিছু ঘটছে তা কোনো অবচেতন এবং উদ্দেশ্যহীন সত্তার ছেলেখেলা নয়। সে বিশ্বাস করে, এটি সর্বজ্ঞানী ও একক সত্তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। কাজেই তার সাথে যা ঘটছে, তা বিশ্বজনীন পরিকল্পনারই একটি অংশ। এভাবেই মানুষ তার আপন সত্তা এবং বস্তুগত জগতের তত্ত্ব-উপাত্ত—যাকে আমরা প্রকৃতি বলে থাকি—তার সাথে বিদ্যমান তিক্ত বৈপরীত্যের সমাধান করতে পারে।

মানুষ তার রুহের জটিলতর গঠন, আকাঙ্ক্ষা ও ভীতি, আবেগ ও অনুভূতি এবং কাল্পনিক অনিশ্চয়তাকে সাথে করে নিজেকে এমন এক স্বভাব-চরিত্রের মুখোমুখি দেখতে পায়, যেখানে উদারতা ও নিষ্ঠুরতা এবং বিপদ

ও নিরাপত্তার মিশেল ঘটেছে এক বিচিত্র ও অকল্পনীয় পন্থায়। মানুষের চিন্তাশক্তির ধরন ও কর্মপদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে তা কাজ করে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন কিংবা পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান আজও এই বৈপরীত্যের সমাধান করতে পারেনি।[৪]

ঠিক এ জায়গাতে এসেই 'ধর্ম' সমাধান দিয়ে যায়। ধর্মীয় দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষকে তার আত্মসচেতন সত্তা এবং আপাতদৃষ্টিতে বেপরোয়া ও সুপ্ত স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে, একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে। কেননা, মানুষের আত্মসচেতনতা এবং তার মন-মগজ ও স্বভাব-চরিত্র—একক এবং অদ্বিতীয় স্রষ্টার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে।

ধর্ম মানুষকে অপরিমেয় কল্যাণ প্রদান করে। (মানুষের মধ্যে) এই উপলব্ধি জাগ্রত করে যে, সে সৃষ্টির অন্তহীন এবং চিরস্থায়ী পরিবর্তনের একটি সুপরিকল্পিত ইউনিট। অসীম বিশ্ব-নিয়তির একটি সুনির্ধারিত অংশ। এই ধারণার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব হলো, এটি মানুষের অন্তরে আধ্যাত্মিক নিরাপত্তার গভীর অনুভূতি (জাগ্রত করে)। যার মাধ্যমে আশা এবং ভয়ের ভারসাম্য বজায় থাকে। এর ফলেই ধার্মিক এবং অধার্মিক ব্যক্তির মধ্যে বিস্তর ফারাক তৈরি হয়। এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে একই রকম। মূল মতবাদ যা-ই হোক না কেন, স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার নৈতিক আহ্বান সব ধর্মের নিকট একই। কিন্তু ইসলামই একমাত্র দ্বীন, যা সকল ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

'জীবন মূলত (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিকের) সমন্বয়'—দ্বীন ইসলাম স্রেফ এ শিক্ষাই দেয় না। মহান সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এই দ্বীন, বাস্তবসম্মত পন্থাও দেখিয়ে দেয়। যার মাধ্যমে আমরা 'ঈমান ও আমলের' সমন্বয় করে আমাদের জীবন-যাত্রা ও চিন্তা-চেতনাকে পুনর্গঠন করতে পারি।

জীবনের এই মহৎ উদ্দেশ্যটি অর্জনের জন্যে ইসলাম দুনিয়াকে বর্জন করতে বলে না। আত্মশুদ্ধির জন্যে কঠোর (সাধনার) মাধ্যমে কোনো বাতিনি দরজাও খুলতে বলে না। নাজাতের জন্যে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় না

[৪] রুহানি বা মনোজগতের ধরন ও এর কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিজ্ঞান কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কারণ, এটা পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। - (অনুবাদক)

কোনো দুর্বোধ্য অন্ধবিশ্বাস। এই ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলামে নিতান্তই অমূলক। কারণ, এটি কোনো বাতিনি মতবাদ বা জীবনদর্শন নয়। এটা তো খুবই সহজ-সরল এক জীবনবিধান। মানুষের ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি তা নাযিল করেছেন।[৫] আর এই দ্বীনের অতুলনীয় কীর্তি হলো, মানবজীবনে আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূর্ণ সমন্বয়। দুটোকে কেবল এ অর্থেই সমন্বয় করা হয়নি, যাতে করে মানুষের দৈহিক ও নৈতিক সত্তার মধ্যে কোনোরূপ সুপ্ত বিরোধ না-থাকে। বরং বাস্তব জীবনে এদের পাশাপাশি অবস্থান ও একাত্মতার বিষয়টিকে ফিতরাতগত বুনিয়াদ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, ইসলামে নামাজের ধরন ব্যতিক্রমী হওয়ার কারণ এটিই। এখানে আত্মিক একাগ্রতা এবং শারীরিক কসরতের সমন্বয় রয়েছে।[৬]

ইসলাম-বিদ্বেষীরা প্রায়ই নামাজের ধরনকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে বলতে চায় : 'ইসলাম একটি আনুষ্ঠানিক ও লৌকিকতার ধর্ম।' অন্যান্য ধর্মের লোকেরা ইসলামকে সহজে মেনে নিতে পারে না। গোয়ালা যেমন দুধ থেকে মাখন আলাদা করার (ব্যাপারে পটু), একইভাবে তারাও বাহ্যিকতা থেকে আধ্যাত্মিকতাকে পৃথক করার কাজে পারদর্শী। তারা বুঝতে চায় না, ইসলামের দুধে দুই ধরনের উপাদানই বিদ্যমান। গঠনশৈলীর দিক থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যিকতা ও আধ্যাত্মিকতা পাশাপাশি অবস্থান করে। এবং নিজেদেরকে প্রকাশ করে একযোগে। অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামের নামাজ আত্মিক একাগ্রতা ও শারীরিক কসরতের সমন্বয়। কারণ, মানুষের জীবনটাই তো এ ধরনের মিশেলে গঠিত। এ ছাড়া আরও একটি কারণ রয়েছে। তা হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন, সেগুলোর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে হবে।

---

[৫] প্রতিটি শিশুই ইসলামি ফিতরাতের ওপর জন্ম নেয়। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে (ইসলামি) ফিতরাতের ওপর। এরপর তা মা-বাপ তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারি রূপে গড়ে তোলে।" [বুখারি, *আস-সহীহ,* ১/১২৭৫] তাই জন্মগতভাবে মানুষের যত প্রয়োজন আছে, ইসলাম সেগুলোর সাথে মানানসই এক দ্বীন। – (অনুবাদক)

[৬] আত্মিক একাগ্রতা মানে খুশু-খুজু, আর শারীরিক কসরত মানে সালাতের ভেতরকার আহকাম, যেমন : কিয়াম-রুকু-সাজদা ইত্যাদি। – (অনুবাদক)

ইবাদতের এই ধারণার আরও একটি নিদর্শন দেখা যায় মক্কায়। কাবার চারিদিকে তাওয়াফের বিধান (পালনের) ক্ষেত্রে। পবিত্র ভূমিতে দাখিল হওয়া সকলের জন্যে সাতবার কাবার চারপাশে (তাওয়াফ) করা ফরজ। মক্কায় হজ পালন করার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি আহকামের একটি হলো তাওয়াফ। এখন আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারি—'এর তাৎপর্য কী?' 'এরকম প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নিজেদের দ্বীনদারিতা জাহির করাটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ?'

এই প্রশ্নের উত্তর একদম পষ্ট। চক্রাকারে কোনো বস্তুর চারপাশ প্রদক্ষিণ করে, আমরা মূলত ওটাকে আমাদের কাজ-কর্মের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দাঁড় করাই। প্রতিটি মুসলিম নামাজের সময় কাবার দিকে মুখ ফেরানোর মাধ্যমে আল্লাহর এককত্বের সাক্ষ্য দেয়। তাওয়াফের সময় হাজিদের প্রদক্ষিণের বিষয়টি জীবনের গতিশীলতাকে নির্দেশ করে। কাজেই, তাওয়াফ কেবল আমাদের ইবাদতের তরিকার দিকেই ইঙ্গিত করে না। এটাও নির্দেশ করে যে, আমাদের বাস্তব জীবন ও সকল চেষ্টা-সাধনা অবশ্যই মহান আল্লাহ এবং তাঁর তাওহীদকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতে হবে। যেমনটা কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦

"আমি জিন ও মানুষকে শুধু এজন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।" [সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫৬]

ইসলামে ইবাদতের ধারণা অন্যান্য সকল ধর্ম থেকে আলাদা। ইবাদত স্রেফ নামাজ-রোজার মতো কিছু শাস্ত্রীয় প্রথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের গোটা জীবনটাই এর অন্তর্ভুক্ত।[৭] আমাদের পুরো জীবনের উদ্দেশ্যই

[৭] জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর দাসত্বের প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কেবল, নামাজ-রোজাই ইবাদত নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, হাঁটা-চলা, খাওয়া-দাওয়া, এমনকি টয়লেটে যাওয়াটাও আমাদের জন্যে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে, যদি আমরা আল্লাহর বিধান ও নবিজির সুন্নাহ অনুযায়ী তা পালন করতে পারি। যত দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ-সমৃদ্ধিকর অবস্থার মধ্য দিয়েই আমরা জীবন অতিবাহিত করি না কেন, প্রতিটি ক্ষণই আমাদের জন্যে মূল্যবান। আমরা যদি আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থেকে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি, তা হলে প্রতিটি ক্ষণে অর্জন করব

হলো আল্লাহর ইবাদত। তাই সামগ্রিকভাবে জীবনকে বিবেচনা করতে হবে নৈতিক দায়িত্বের আধার হিসেবে। আমাদের মামুলি কাজও ইবাদত মনে করে পালন করতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিটি কাজ মহান আল্লাহর বিশ্বজনীন পরিকল্পনার একটি অংশ। তাই বুঝেশুনে পা ফেলতে হবে। এই ধরনের পদক্ষেপ মানুষের জন্যে দূরদর্শী আদর্শ হতে পারে। কিন্তু আদর্শের বাস্তবায়ন করাটাও কি ধর্মের উদ্দেশ্য নয়?

এই ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার। প্রথমত, এই দ্বীন আমাদেরকে শেখায়—সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করাটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, এই উদ্দেশ্য অধরাই থেকে যাবে, যদি আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দিককে জীবন থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং কাজে-কর্মে অবশ্যই এ-দুটোর সমন্বয় থাকতে হবে। তাওহীদের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস, জীবন-সংগ্রামের পরতে পরতে সেটার সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই, আমার জানা অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের বিস্তর ফারাক সৃষ্টি হয়।

ইসলাম কেবল মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যকার রুহানি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার তালিম দিয়েই ক্ষান্ত হয় না। ব্যক্তি ও তার সামাজিক অবস্থানের সাথে ইহকালীন সম্পর্কটাও বিশ্লেষণ করে দেয়। ইসলামে দুনিয়ার জীবনকে নিছক ছেলেখেলা, (কিংবা) আখিরাতের পূর্ববর্তী নিরর্থক বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। বরং দুনিয়া হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থবহ এক সৃষ্টি। আল্লাহ কেবল সত্তাগতভাবেই একক নন, কর্তৃত্বের দিক থেকেও একক। সেজন্যে, উপাদানগত দিক থেকে তাঁর সৃষ্টিজগৎ হয়তো ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক থেকে তারা সকলেই এক।

ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, 'তাকওয়া' বা 'আল্লাহ-সচেতনতা' জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি রূপরেখা প্রদান করে। মানুষ-যে ইহকালেই

অশেষ নেকি। প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে যাবে ইবাদত, হয়ে যাবে কল্যাণকর। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুমিনের বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যকারও ক্ষেত্রে সেটি প্রজোয্য নয়। তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা হয় তার জন্যে কল্যাণকর। আর দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হলে ধৈর্যধারণ করে, ফলে তাও হয় তার জন্যে কল্যাণকর।" (মুসলিম, *আস-সহীহ*, ৭২২৯) – (অনুবাদক)

(আত্মশুদ্ধির) সর্বোচ্চ মাকামে পৌঁছতে পারবে, ইসলামই আমাদেরকে সেটা দেখিয়ে দেয়। সকল ধর্মীয় বিধানের মধ্যে ইসলাম একাই ঘোষণা করে—'দুনিয়ার জীবনেই ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব।' ইসলাম বলে না, এই উৎকর্ষতার জন্যে শারীরিক চাহিদাকে দমন করতে হবে, যেমনটা খ্রিস্টধর্ম বলে থাকে। এই কথাও বলে না যে, ধারাবাহিক পুনঃজন্মের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ মাকামে পৌঁছনো যায়, যেমন কথা রয়েছে হিন্দুধর্মে। এটা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে না, ব্যক্তিসত্তার সাথে দুনিয়ার আবেগপ্রবণ সম্পর্ক বিনাশের মাধ্যমেই পূর্ণতা ও মুক্তি লাভ করা সম্ভব। না, ইসলাম খুব জোরালোভাবে বলে দেয়—জন্মগত প্রতিভা এবং দুনিয়াবি সকল সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে ইহজগতেই মানুষ ব্যক্তিগত 'পূর্ণতায়' পৌঁছতে পারে।

পরিপূর্ণতা শব্দটি এখানে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, ভুল বুঝাবুঝি এড়ানোর জন্যে তার ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ দুর্বল। তাই 'Absolute perfection' বা 'পরম[৮] পূর্ণতা'-র খেয়াল আমরা বিবেচনায় আনতে পারি না। কারণ 'Absoluteness' বা পরমত্বের গুণ স্রেফ ঐশ্বরিক জগতের বৈশিষ্ট্য। শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেই মানবীয় পূর্ণতা আসে। আর নৈতিকতার দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা আপেক্ষিক এবং খুবই সীমাবদ্ধ। তাই পরিপূর্ণতা বলতে কল্পনাযোগ্য সকল গুণের অধিকারী হওয়া, কিংবা বাহ্যিকভাবে নিত্যনতুন গুণাবলি অর্জন করাকেও বোঝায় না। এটি আসলে "ব্যক্তির মধ্যকার উত্তম গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে, তার অভ্যন্তরীণ সুপ্ত কর্মশক্তিকে জাগ্রত করে।"

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সহজাত গুণাবলির ভিন্নতা রয়েছে। তাই সকল মানুষ একই ধরনের প্রচেষ্টা চালাবে এবং একই মাত্রার পূর্ণতা অর্জন করবে, এটা খুবই হাস্যকর ব্যাপার। এটা তো দৌড় প্রতিযোগিতার ঘোড়া এবং মালবাহী ঘোড়ার কাছে একই ধরনের দক্ষতা আশা করার শামিল। এ দুই ঘোড়া হয়তো স্বতন্ত্রভাবে পরিপূর্ণ এবং চলনসই। কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য যেহেতু আলাদা, তাই তাদের মধ্যে ভিন্নতা

[৮] দার্শনিক অর্থে পরম হলো আত্মা ও বিশ্ব-প্রকৃতির মূল উৎস, মূল কারণ ও অন্তর্নিহিত সত্তা। আত্মা ও বিশ্ব-প্রকৃতি যাঁর মাধ্যমে ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তিনিই পরম বা স্বয়ংসম্পূর্ণ (Absolute)। [সুপ্রকাশ রায়, *পরিভাষা কোষ*, পৃ. ৩২] – (অনুবাদক)

থাকবেই। মানুষের ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই রকম। যদি পূর্ণতার একটি নির্দিষ্ট ধরনকেই মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়—যেমনটা বৈরাগী সাধুদের ক্ষেত্রে খ্রিস্টানরা করে থাকে—তবে তো মানুষের স্বতন্ত্র পার্থ্যকগুলোকেও ছুড়ে ফেলতে হবে। অথবা পরিবর্তন করতে হবে, নয়তো দমিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু এর ফলে 'ব্যক্তিগত স্বকীয়তা'র লঙ্ঘন ঘটবে। কিন্তু স্বকীয়তা তো আসমানি বিধান। দুনিয়ার সমস্ত প্রাণের ওপর তা কর্তৃত্বশীল।

ইসলাম কোনো জোর-জবরদস্তির ধর্ম নয়। মানুষকে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অবারিত (সুযোগ) সে প্রদান করে। ফলে অভ্যন্তরীণ গুণাবলি, মন-মেজাজ ও চিত্ত-বিকাশের জন্যে ব্যক্তি তার আপন প্রবণতা অনুযায়ী নিজেই পথ খুঁজে নিতে পারে। এভাবেই একজন মানুষ শারীয়ার সীমারেখার মধ্যে থেকে কঠোর সংযমী হতে পারবে। কিংবা উপভোগ করতে পারবে যৌনতার ষোলো আনা সুখ। চাইলে সে যাযাবরের মতো মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতেও পারবে, যার কাছে থাকবে না আগামী দিনের কোনো খাবার। কিংবা সে হয়ে যেতে পারবে অঢেল সম্পদের অধিকারী কোনো বিত্তশালী বণিক। আল্লাহর দেওয়া বিধানের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং অনুগত থেকে, সে তার ব্যক্তিজীবনকে জন্মগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা গড়তে পারবে। তার দায়িত্ব হলো সর্বোচ্চ মাত্রায় চেষ্টা করা। যাতে করে আল্লাহ তাকে নিয়ামত হিসেবে যে হায়াত দিয়েছেন, সে তার কদর করতে পারে। একইসাথে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে তার সতীর্থদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং বাহ্যিক চেষ্টা-সাধনার সহায়ক হতে পারে।

এই দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনের ওপর কোনো 'একক মানদণ্ড' চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। শারীয়ার সীমারেখার মধ্যে থেকে, তাকে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ইসলামের এই উদারনীতি মূলত মানুষের ফিতরাতগত কল্যাণ-প্রবণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৯]

---

[৯] মানুষের জন্মগত কোনো চাহিদাকেই ইসলাম অস্বীকার করে না। যেমন ধরুন যৌনতা। খ্রিস্টধর্ম-সহ বেশকিছু ধর্মে বুজুর্গ হওয়ার মাপকাঠি হলো যৌনতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা, ঘর-সংসার না করা, নারীদের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকা। এর চেষ্টাও করা হয়েছে বহুত। কিন্তু সব গুড়েবালি। চার্চে বেড়েছে যৌন সহিংসতা। পাদ্রিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি কোমলমতি শিশুরাও। নিজেদের যৌনসাধ মেটাতে এদেরকেও ব্যবহার করেছে যাজকরা।

খ্রিস্টানদের মতে মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। হিন্দুদের মতে মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই নীচ ও অশুচি। পূর্ণতায় পৌঁছতে হলে তাকে অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক দেহান্তরের একটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। ইসলাম এসব ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করে। সে পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলে, মানুষ জন্মগতভাবে নিষ্পাপ ও যথাসম্ভব পরিপূর্ণ—ওপরে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এটা কুরআনেই বলা হয়েছে :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

"অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।" [সূরা তীন, ৯৫ : ৪]

কিন্তু ওই একই সূরায় কুরআন বলে যায় :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

"তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীনদের হীনতম রূপে। তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে তো রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।" [সূরা তীন, ৯৫ : ৫-৬]

আয়াতগুলোতে এ কথাই বয়ান করা হয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ধার্মিক এবং নিষ্পাপ। সাথে সাথে এও বলা হয়েছে, স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাস ও

আসলে, ফিতরাতের সাথে বিদ্রোহ করে মানুষ কখনো চলতে পারে না। আল্লাহ তাআলা জন্মগত যেসব চাহিদা দিয়েছেন, সেগুলো নিয়েই বুজুর্গ হতে হবে, আল্লাহ-ওয়ালা হতে হবে। এগুলোকে বাদ দিয়ে কেবল ভংচং করলে, আমও যাবে ছালাও যাবে। পাশাপাশি বাড়বে সহিংসতা।

ইসলামে এমন কোনো বিধান দেওয়া হয়নি, যা মানুষের ফিতরাতের সাথে সাংঘর্ষিক। বরং সবকিছুই সংগতিপূর্ণ। চাই সেটা বুঝে আসুক বা না-আসুক। আমাদের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ তাআলা। আর তিনি জানেন, আমাদের ফিতরাত কী চায়। তাই, তাঁর মনোনীত দ্বীন ফিতরাতের কল্যাণ-প্রবণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর সে কারণেই, সামনের দিনগুলোতে ইসলাম আবার বিজয়ী শক্তি হিসেবে ফিরে আসবে। মানুষ নিজে থেকেই এটাকে সাদরে গ্রহণ করে নেবে। কারণ, এ-যাবৎ যত মতবাদ মানুষ আবিষ্কার করেছে, সবগুলোই ফিতরাতের সাথে সাঙ্ঘর্ষিক। আজ হোক বা কাল, এগুলোর ধ্বংস অনিবার্য। স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে যুদ্ধ করে মানুষ বেশিক্ষণ চলতে পারে না। ফিতরাগত দ্বীনের দিকে তাকে ফিরে আসতেই হবে। - (অনুবাদক)

বদস্বভাবের কারণে মানুষের মৌলিক গুণাবলি বিনষ্ট হতে পারে। অপরদিকে, এই মৌলিক গুণাবলি বজায় রাখতে কিংবা পুনরুদ্ধার করতে মানুষ তখনি সক্ষম হবে, যখন-সে স্রষ্টার তাওহীদকে উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাঁর বিধানের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে দেবে।

ইসলাম বলে, পাপিষ্ঠতা কখনোই মৌলিক গুণ নয়। এমনকি আদিতেও এটা ছিল না। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যেসব সহজাত উত্তম গুণাবলি দ্বারা সাজিয়েছেন, তার অপব্যবহারের ফলেই মানুষ এটা অর্জন করেছে। একটু আগেই বলা হয়েছে, এসব সহজাত গুণাবলি একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম। কিন্তু বরাবরই এগুলো ছিল নিখুঁত। আর মানুষের দুনিয়াবি জীবনেই এসবের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটা সম্ভব।

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ভিন্নতর অনুভূতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির কথা চিন্তা করে আমরা এটা ভেবে নিয়েছি—মৃত্যু আমাদেরকে নিত্যনতুন যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রদান করবে। ফলে মানুষের রুহ পৌঁছে যাবে আরও উঁচু মাকামে। কিন্তু এই (ধারণা) তো আমাদেরকে স্রেফ অনাগত জীবন সম্পর্কেই সচেতন করে। তাই ইসলাম খুব পষ্টভাবে ঘোষণা করে, ব্যক্তিগত উত্তম গুণাবলি বিকশিত করার মাধ্যমে ইহকালেও আমরা পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারব। আধ্যাত্মিক দিকটা ঠিক রেখে, দুনিয়ার জীবনকে শতভাগ এস্তেমাল করার ব্যাপারটিকে একমাত্র ইসলামই সম্ভবপর করে তুলেছে। খ্রিস্টানদের ধারণার চেয়ে এটি কতই-না আলাদা!

খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী, মানবজাতি আদম ও ইভের করা আদিপাপের[১০] বোঝা বহন করছে। কাজেই, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের গোটা জীবনকে বিষাদময় মনে করতে হবে। দুনিয়াটা যেন দুটি বিপরীতমুখী শক্তির রণক্ষেত্র। একটি হলো খারাপ স্বভাব, যা শয়তানের প্রতিরূপ। আরেকটি ভালো গুণ,

[১০] বাইবেলের বক্তব্য হলো, আদম ও ইভকে ঈশ্বর স্বর্গে রেখেছিলেন। সেখানে তাদের সবকিছু করার স্বাধীনতা ছিল। শুধু একটি গাছের কাছে যেতে ঈশ্বর তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ইভ শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ওই গাছের ফল খেয়ে মহাপাপ করে ফেলেন। যার কারণে, ঈশ্বর মানব-জাতিকে অভিশাপ দেন। আর সকল মানুষ জন্মগতভাবেই এই পাপের বোঝা বহন করে চলছে। বাইবেলের ভাষায় একে বলা হয় 'আদিপাপ' (Original sin/Ancestral sin)। - (অনুবাদক)

যা যিশুখ্রিস্টের প্রতিরূপ। দেহকে প্ররোচিত করার মাধ্যমে শয়তান চিরন্তন কল্যাণের দিকে রুহের যাত্রাকে ব্যহত করতে চায়। আত্মা বা রুহ জুড়ে আছে যিশুখ্রিস্টের সাথে। আর দেহ হলো শয়তানের আড্ডাখানা। কেউ হয়তো ভিন্নভাবে বলতে পারে—দুনিয়ার সবকিছুই অভিশপ্ত।[১১] অপরদিকে আসমানি জগৎ পবিত্র এবং কল্যাণকর।[১২] খ্রিস্টধর্ম বলতে চায় : "মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে থাকা পার্থিব জিনিসের চাহিদা কিংবা দৈহিক কামনা হলো শয়তানের কাছ থেকে আদমের আত্মঘাতী উপদেশ নেওয়ার ফল। সুতরাং, নাজাতের জন্যে মানুষের অন্তরকে রক্ত-মাংসের জগৎ থেকে সরিয়ে এনে অনাগত কাল এবং রুহানি জগতমুখী করতে হবে। কেননা, ক্রুশে ঝুলে যিশু নিজেকে উৎসর্গ করছেন বলেই, মানুষ আদিপাপ থেকে নিস্তার পেয়েছে।"

এই মতবাদ কখনোই সত্যিকার অর্থে মেনে চলা হয়নি। তারপরও এই ধরনের শিক্ষা বিদ্যমান থাকার ফলে ধর্মানুরাগী ব্যক্তির অন্তরে দীর্ঘমেয়াদী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দুনিয়াকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করার আবশ্যপালনীয় আহ্বান এবং জীবনকে উপভোগ করার জন্মগত বাসনার দোলাচলে পড়ে যায় সে। আদিপাপের ধারণা এবং এর গুপ্ত রহস্য সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। অপরদিকে, এ-থেকে নাজাত পাওয়ার জন্যে ক্রুশে ঝুলে যিশুর যন্ত্রণা-ভোগের বিষয়টি—আধ্যাত্মিকতার প্রতি ব্যক্তির গভীর আগ্রহ

[১১] বাইবেলে বলা আছে, আদম ও ইভের আদিপাপের কারণে ঈশ্বর তাদেরকে অভিশাপ দেন। তিনি ইভকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, "আমি তোমার সন্তান প্রসবের ব্যথা খুব বাড়িয়ে দেব; প্রচণ্ড প্রসববেদনা সহ্য করে তুমি সন্তানের জন্ম দেবে। তোমার স্বামীর প্রতি তোমার আকুল বাসনা থাকবে, আর সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে।" [আদিপুস্তক, ৩/১৬] আবার তিনি আদমকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, "তোমার জন্যে ভূমি অভিশপ্ত হলো; আজীবন তুমি কঠোর পরিশ্রম করে তা থেকে খাবার খাবে। তোমার জন্যে কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা ফলাবে, আর তুমি খেতের লতাগুল্ম খাবে। যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাচ্ছ, ততদিন তুমি কপালের ঘাম ঝরিয়ে তোমার খাবার খাবে।" [আদিপুস্তক, ৩/১৭-১৯]

তাই খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী, গোটা দুনিয়াই হলো অভিশপ্ত জায়গা। দুনিয়াতে মানুষের জন্যে কল্যাণকর কিছু নেই। - (অনুবাদক)

[১২] খ্রিস্টানদের কাছে দুনিয়াবি জগৎ আর আসমানি জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। আগুন এবং পানি যেমন একত্র হতে পারে না, তেমনি এই দুটিও পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না। আসমানি জগতে নাজাতের পথ, দুনিয়াবি জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ওই জগতে প্রবেশ করতে হলে যৌনতার মতো জন্মগত বৈশিষ্ট্যকেও এড়িয়ে চলতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে পার্থিব জগতের সকল উপকরণ। তবেই মানুষ আসমানি জগতে কল্যাণ লাভ করবে। - (অনুবাদক)

এবং জাগতিক জিনিসের প্রতি বৈধ কামনা—এ দুটোর মাঝে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়।

ইসলামে আদিপাপ বলতে কিছু নেই। আমরা এই ধরনের কল্পিত বিষয়কে মহান আল্লাহর ন্যায়বিচারের সাথে সাঙ্ঘর্ষিক মনে করি। আল্লাহ তাআলা পিতামাতার পাপের জন্যে কখনো সন্তানকে দায়ী করেন না। তাহলে তিনি কী করে আদিপিতার অবাধ্যতাজনিত পাপের কারণে মানবজাতির অগণিত প্রজন্মকে দোষী করবেন? এমন অদ্ভুত ধারণার পক্ষে দার্শনিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোটা হাতুড়েপনা ছাড়া কিছুই নয়। একজন আকলমান্দ বুদ্ধিজীবী এটাকে ত্রিত্ববাদের মতোই মানবরচিত এবং পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য করেন। ইসলামে যেহেতু আদিপাপের কোনো স্থান নেই, তাই সর্বজনীন নাজাত বলেও কিছু নেই। এখানে নাজাত ও শাস্তি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। প্রত্যেক মুসলিম নিজেই তার নাজাতের (জন্যে দায়ী)। পরকালীন সফলতা এবং ব্যর্থতার হিল্লোল সে নিজেই তৈরি করে তার মানসপটে। মানুষের ব্যাপারে কুরআন বলে :

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

"সে যা ভালো কাজ করেছে, সে তার সাওয়াব পাবে। আর স্বীয় মন্দ কাজের জন্যে, সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে।" [সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৬]

আরেকটি আয়াত বলছে :

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

"মানুষ যা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা-সাধনা করে, তা ছাড়া আর কিছুই পায় না।" [সূরা নাজম, ৫৩ : ৩৯]

ইসলাম জীবন সম্পর্কে সাধু পৌলের অনুসারী খ্রিস্টানদের মতো অস্পষ্ট ধারণা দেয় না। আবার আধুনিক পশ্চিমাদের মতো দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন আসক্ত হতেও বলে না। খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি দুনিয়ার জীবনকে দেখে অভিশপ্ত হিসেবে। কিন্তু নব্য পশ্চিমারা আজ এথেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তারা

এমনভাবে দুনিয়ার পূজা করে, যেভাবে পেটুক বন্দনা করে তার খাবারকে।[১৩] পেটুক টপাটপ গিলতে থাকে, কিন্তু কোনো হদিস রাখে না।

অন্যদিকে ইসলাম দুনিয়ার জীবনকে (মুক্তোয় আঁটা) ঝিনুক হিসেবে দেখে ও সম্মান করে। ইসলাম কখনোই দুনিয়াকে পুজো করতে বলে না। বরং উচ্চতর মাকামে পৌঁছনোর গঠনমূলক পর্যায় হিসেবে একে বিবেচনা করে। যেহেতু দুনিয়ার জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, তাই একে ঘৃণার চোখে দেখা বা অবমূল্যায়ন করার অধিকার মানুষের নেই। দুনিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের সফর মূলত ঐশী পরিকল্পনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং, দুনিয়ার জীবনের মূল্য অনেক। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এটা কেবল (নাজাতের) সহায়ক হিসেবেই মূল্যবান।[১৪]

ইসলামে বস্তুবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো স্থান নেই। যেমনটা আধুনিক পশ্চিমারা বলে থাকে—'এই দুনিয়াই আমার সব।'[১৫] আবার খ্রিস্টানদের মতো জীবনের প্রতি একরাশ ঘৃণা প্রকাশ করে (ইসলাম বলে না)—'দুনিয়াতে আমার জন্যে কোনো কল্যাণ নেই।'[১৬] ইসলাম মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। কুরআন আমাদেরকে (এই) দুআ করতে বলে :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও।" [সূরা বাকারাহ, ২ : ২০১]

এভাবেই দুনিয়াকে কদর করা হয়। আর দুনিয়াবি উপকরণ কখনো আমাদেরকে আখিরাতের পথে কষ্ট-মুজাহাদা করতে বাধা দেয় না। বস্তুগত উন্নতি আমরা

[১৩] আরেকটি অনুবাদ হতে পারে : "তারা এমনভাবে দুনিয়াকে ভালোবাসে, যেভাবে পেটুক ভালোবাসে তার খাবারকে।"

[১৪] দুনিয়ার জীবনকে এস্তেমাল করার মাধ্যমেই আমাদেরকে আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে হয়। আখিরাতের জীবনে আমরা কি জান্নাতী হব নাকি জাহান্নামী—এটা নির্ভর করে দুনিয়াতে আমরা আল্লাহর বিধান ঠিক কতখানি বাস্তবায়ন করেছি তার ওপর। পরকালীন নাজাত পাওয়ার জন্যে দুনিয়াটা হলো সাওয়াব অর্জনের জায়গা। এই অর্থে দুনিয়া অনেক মূল্যবান। কিন্তু আখিরাতের সুখ-শান্তি ও অফুরন্ত নিয়ামতের তুলনায় দুনিয়া অনেক তুচ্ছ। - (অনুবাদক)

[১৫] শাব্দিক অনুবাদ : "কেবল এই দুনিয়াটাই আমার রাজ্য।"

[১৬] শাব্দিক অনুবাদ : "দুনিয়া আমার রাজ্য নয়।"

চাই। কিন্তু সেটা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমাদের সমস্ত কষ্টের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো উৎকর্ষতা। এমন ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যবস্থা চালু রাখা, যা মানুষের নীতি-নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটাবে। এই মূলনীতিকে সামনে রেখে, ইসলাম ছোট-বড় সকল কাজের ক্ষেত্রেই মানুষকে তার নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। "যা কিছু সিজারের প্রাপ্য, তা সিজারকে দাও। আর যা ঈশ্বরের প্রাপ্য, তা ঈশ্বরকে দাও"[১৭]—বাইবেলে বর্ণিত এই ধরনের চটকদার আদেশের স্থান ইসলামে নেই। প্রথমত, ইসলামের (বিশ্বাস অনুযায়ী) মহান আল্লাহই সমস্ত কিছুর মালিক।[১৮] দ্বিতীয়ত, নীতি-নৈতিকতা এবং জীবনের আর্থ-সামাজিক চাহিদার মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ আছে, ইসলাম এটা স্বীকার করে না।

ভালো ও মন্দের মধ্য থেকে সর্বদা কেবল একটিকেই বেছে নেওয়া যেতে পারে। দুটোর মাঝামাঝি থাকার কোনো সুযোগ নেই। তাই তো নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে 'কাজের' ওপর ইসলাম এতটা জোর দেয়। প্রতিটি মুসলিমের আশেপাশে যত ঘটনা ঘটছে, এর কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে নিজেকেই দায়ী মনে করে। ভালো কিছু প্রতিষ্ঠা এবং মন্দকে উৎখাত করার জন্যে তাকে সব দিক থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। কুরআনের আয়াতেও এই ধরনের কাজের অনুমোদন মেলে :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করবে।" [সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১১০]

---

[১৭] মার্ক ১২ : ১৭; মথি ২২ : ২১; লূক ২০ : ২৫।

[১৮] আল্লাহ তাআলা বলেন, "আসমান ও জমিন, আর এদের মাঝে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আর সবাইকে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" [সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ১৮] আরও দেখুন : সূরা মায়িদা, ৫ : ৪০, ১২০; সূরা নূর, ২৪ : ৪২; সূরা ফুরকান, ২৫ : ২; সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৩; সূরা যুমার, ৩৯ : ৬, ৪৪; সূরা শুরা, ৪২ : ৪৯; সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২৭; সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ১৪; সূরা আল-হাদীদ, ৫৭ : ২, ৫; সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১, সূরা বুরূজ, ৮৫ : ৯। - (অনুবাদক)

ইসলামের দুর্নিবার অগ্রযাত্রা এবং প্রাথমিক যুগে সাফল্য পাওয়ার নৈতিক কারণ এটাই। (পশ্চিমারা) একে তথাকথিত 'সাম্রাজ্যবাদী' মনোভাব হিসেবে আখ্যা দেয়। 'সাম্রাজ্যবাদ' পরিভাষাটির ওপর গোঁ ধরলে হয়তো বলা যায় যে, ইসলাম কখনো হয়তো এমনটা করেছে। কিন্তু এই ধরনের কর্মতৎপরতার পেছনে আধিপত্য বিস্তারের কোনো লালসা ছিল না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি, কিংবা পরের টাকায় পোদ্দারি করার জন্যেও এটা করা হয়নি। অমুসলিমদেরকে জোর করে ইসলামের আবরণে (মুড়িয়ে দেওয়ার) লক্ষ্যও এতে ছিল না। এর পেছনে স্রেফ একটি উদ্দেশ্যই ছিল, যেটা আজও আছে। তা হলো, মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যে সর্বোত্তম দুনিয়াবি কাঠামো নির্মাণ করা।

নৈতিক আদর্শ মানুষের ভেতর আপনা-আপনিই নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ না-করে, প্লেটুর মতো কেবল 'ভালো-মন্দ' নির্ণয় করেই ক্ষান্ত থাকাটা মোটাদাগে একটা অনৈতিক কাজ। কারণ, দুনিয়ার বুকে যে (আদর্শ)কে বিজয়ী করার জন্যে মানুষ তৎপর হয়, তার ওপরই মূলত নৈতিকতার বাঁচা-মরা নির্ভর করে।
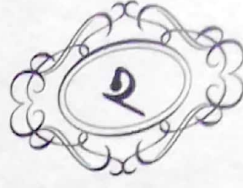
পাশ্চাত্য সভ্যতার বুনিয়াদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি ইসলামের নৈতিক বুনিয়াদের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ইতিমধ্যেই আমরা বুঝতে পেরেছি, ধর্মীয় অনুশাসনের[১৯] যে পরিপূর্ণ রূপরেখা ইসলামি সভ্যতা প্রদান করেছে, ইতিহাস তা কখনোই প্রত্যক্ষ করেনি। ইসলামে অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয় আখিরাতকে। এটাকে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে তুলনা করলে, আকাশ-পাতাল ব্যবধান দেখে চোখ কপালে উঠে যায়।

নব্য পশ্চিমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা কেবল উপযোগবাদ[২০] এবং চলমান

---

[১৯] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ২ নং পাদটীকা)** : পষ্ট করে দেওয়ার জন্যে বলছি, পশ্চিমারা সাধারণত 'ধর্মীয় অনুশাসন' শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করে, আমি এখানে সে অর্থে ব্যবহার করিনি। তাদের নিজেস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পশ্চিমারা 'ধর্মীয় অনুশাসন' বলতে চার্চের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বুঝে। তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি মধ্যযুগের খ্রিস্টান চার্চ এবং তার যাজকতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে ইসলামে 'পুরোহিততন্ত্র' কিংবা 'যাজক' বলতে কিছুই নেই। খ্রিস্টান চার্চের মতো কোনো প্রতিষ্ঠানেরও অস্তিত্ব নেই ইসলামে। সুতরাং আমরা মুসলিমরা যখনই 'ধর্মীয় অনুশাসনের' কথা বলি, আমরা কমবেশি একটি সামাজ-রাজনৈতিক কাঠামোর কথা বলি, যেখানে সকল আইন মূলত ওহির বিধান অনুসারে প্রণয়ন করা হয়, যেমন ইসলামি শারীয়া। (বিস্তারিত : আমার লেখা *The Principles of State and Government in Islam* বইটির 'Terminology and Historical Precedent' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

[২০] পুঁজিবাদী সমাজে নীতিশাস্ত্রের একটি তত্ত্ব হচ্ছে উপযোগবাদ (Utilitarianism)। এই তত্ত্ব বলে, যে আচরণ থেকে ব্যক্তি সুখ লাভ করবে, ওটাই মহৎ কাজ। সেটা ঈশ্বরের বিধান দ্বারা সমর্থিত না হলেও কিছু আসে যায় না। ব্যক্তির সুখ-দুঃখ লাভের পরিমাণই ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি। যে আচরণে ব্যক্তি কষ্ট পায়, যেটা অন্যায় কাজ। আর যেটা তাকে সুখ দেয়, সেটাই ন্যায়। তাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে : সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সুখ। একটি জাতির সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সুখ নিশ্চিত করার জন্যে, যে-কোনো কাজই বৈধ। এমনকি সেটা ঈশ্বরের

উন্নতিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। জীবনের নৈতিক বাস্তবতাকে দূরে ঠেলে, শুধুমাত্র বাহ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করাই ওদের মৌলিক উদ্দেশ্য। যার ফলে জীবনের প্রকৃত মর্ম ও লক্ষ্য কী, এ প্রশ্ন নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা বাস্তব-জীবনে কখনো মাথা ঘামায় না। জীবন-যাপনের 'ধরন' কেমন হওয়া উচিত এবং প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে মানবজাতি কতখানি অগ্রসর হয়েছে—এ প্রশ্নগুলোই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শেষোক্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের উত্তর খুবই ইতিবাচক। কিন্তু মুমিনদের ক্ষেত্রে এর উত্তর কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। আদম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর বংশধরদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করতে চাই।"
[সূরা বাকারাহ, ২ : ৩০][২১]

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, দুনিয়াতে মানুষের আধিপত্য বিস্তার এবং অগ্রগতি অর্জন করার বিষয়টি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু মানুষের এই অগ্রগতির 'প্রকার' কী হবে, এই ব্যাপারে ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ভিন্ন। পশ্চিমারা বিশ্বাস করে, দুনিয়াবি সফলতা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আলোকেই সামগ্রিকভাবে মানুষের

বিধানের বাইরে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১ অব্দ) প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু তিনি এটা কেবল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, সমাজের ক্ষেত্রে নয়। আধুনিক কালে এটি সমগ্র মানব-সমাজের ওপর আরোপ করা হয়। দার্শনিক জেরিমি বেন্থাম ছিলেন এই তত্ত্বের প্রবক্তা। তার পর স্টুয়ার্ড মিল এই মতবাদের বিকাশ সাধন করেন। [*Encyclopaedia Britanica*, ২৭/৮২০-৮২২] এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে কারণেই, তারা নিজেদের সুখের জন্যে অন্য জাতির ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাতেও কার্পণ্য করে না। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে, পশ্চিমারা ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতে ওঠে। এতে যদি অন্য জাতির লাখও অ-ইউরোপীয় মানুষের জীবন যায়, তবুও তাদের মধ্যে কোনো অনুশোচনা আসে না। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ যার বাস্তব উদাহরণ।- (অনুবাদক)

[২১] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ৪ নং পাদটীকা)** : উপরিউক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা জানার জন্যে দেখুন : *মেসেজ অফ দ্যা কুরআন*-এর পাদটিকা ২২।

নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী অগ্রগতির এই ধারণা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম জানিয়ে দেয়, মানুষের আত্মিক মূল্যবোধ সর্বদা অপরিবর্তনশীল। আর এটি সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের ফিতরাতের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মানুষের ফিতরাত-যে তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি অনুযায়ী, বাড়ন্ত গাছের মতো চলমান পরিবর্তন ও উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে যেতে পারে—পাশ্চাত্যের মতো ইসলাম এটা কখনোই মেনে নেয়নি। কারণ, মানুষের আত্মা জীববিজ্ঞানের বাইরের জিনিস কি না—এই ধরনের যুক্তিতর্ক থেকে ইসলাম নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। পশ্চিমারা ভেবেছে, বস্তুবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সুযোগ-সুবিধার মতো করে নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। আসলে জীববিদ্যার তত্ত্বকে গায়েবি জিনিসের ব্যাপারে প্রয়োগ করার কারণেই এই মৌলিক গলদটি তাদের হয়েছে। মূলত এ ধারণার ওপর ভর করেই পশ্চিমারা রুহকে অস্বীকার করে। কিন্তু ইসলাম বিশ্বাস করে গায়েবের প্রতি। তাই কোনোরকম সংশয় ছাড়াই স্বীকার করে নেয় আত্মার অস্তিত্বকে।

আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উন্নতি কখনো এক জিনিস নয়, আলাদা। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ এরা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে থাকে। তাই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উন্নতি একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়াটা জরুরি বিষয় নয়। হয়তো কখনো কখনো তারা একই সঙ্গে বিকাশ লাভ করতে পারে।

মানবজাতির বস্তুগত উন্নতির সার্বিক সম্ভাবনা এবং এর প্রতি (মানুষের) তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে ইসলাম খুব জোর দিয়ে স্বীকার করে। কিন্তু (দুনিয়াবি) প্রগতির মাধ্যমেই যে রুহানি জগতের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব, এই ধারণাকে পুরোপুরি নাকচ করে দেয়। আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতির জন্যে যা যা দরকার, তা ব্যক্তিসত্তার মাঝেই সীমাবদ্ধ। প্রতিটি ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির সামগ্রিক চিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আমরা কখনোই দলবদ্ধ হয়ে 'পরিপূর্ণতার' দিকে অগ্রসর হতে পারব না।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে প্রত্যেককে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। তবে সেটা আলাদাভাবে। আর এই কাজের শুরু এবং শেষটাও হবে নিজেকে দিয়েই। অবশ্য এই ধরনের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছনোকে কিছুটা কঠিন করে ফেলে। কিন্তু ইসলামের টেঁকসই সমাজ-কাঠামো ও সামাজিক ঐক্য—পরোক্ষভাবে এটাকে সহজ করে তোলে। সমাজের দায়িত্ব হলো মানুষের বাহ্যিক জীবনকে এমনভাবে গুছিয়ে দেওয়া, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি তার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিপত্তি ছাড়াই এগোতে পারে। যেন সে যথাযথ উৎসাহ পায়। আর এ জন্যেই ইসলামি শারীয়া মানুষের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক জীবন নিয়ে বেশ মাথা ঘামায়। এর জন্যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত, (সেটাও গুরুত্বের সাথে দেখে)।

আমি পূর্বেই বলেছি, এই ধারণার বাস্তবায়ন স্রেফ তখনি সম্ভব—যখন রুহ বা আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হবে। এবং মানুষের জন্মগত অপার্থিব উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে (সমাজ-কাঠামো গড়ে উঠবে)। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা রুহের অস্তিত্বে একপ্রকার অস্বীকার করে। তাই জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে বাস্তবে তারা কখনো মাথা ঘামায় না। আসলে গায়েবি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং এর গুরুত্বকে ওরা তুচ্ছ মনে করে।

"দুনিয়ায় জন্যে সর্বজনীন নৈতিক বিধান ঠিক করে দেওয়া আছে। সেটার আনুগত্য করা সকলের ওপর ফরজ।"—এই নীতির ওপরই 'ধর্মীয় চেতনা' প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক অঙ্গনে নব্য পশ্চিমারা কারও অনুগত্যের ধার ধারে না। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে তারা মূলত (ক্ষমতা এবং) আরাম-আয়েশের পূজা করে। আর এটা সত্যি যে, ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তারের বাসনার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন-দর্শন ফুটে ওঠে।

এইসব চিন্তাধারার সূত্রপাত মূলত প্রাচীন রোমান সভ্যতা থেকে।[২২] পশ্চিমাদের বস্তুবাদী মনোভাবের আঁতুরঘর হিসেবে রোমকে দায়ী করাটা

---

[২২] সম্রাট অগাস্টাস কর্তৃক খ্রিস্টপূর্ব ২৭ অব্দে রোম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশাল রোম-সাম্রাজ্য ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে থিওডোসিউস কর্তৃক পশ্চিম/ল্যাটিন এবং পূর্ব/গ্রিক—এই দুটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়। গ্রিক সাম্রাজ্য ১৪৫৩ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আর ল্যাটিন সাম্রাজ্য ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে বিলুপ্ত হওয়ার পর আবার ৮০০ সালে সম্রাট শার্লেমন কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্রাজ্য ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। [*পরিভাষা কোষ*, পৃ. ৯৬] - (অনুবাদক)

অনেকের কাছে হয়তো অদ্ভুত মনে হতে পারে।[২৩] বিশেষ করে যারা প্রাচীন ইসলামি সভ্যতার সাথে প্রায়ই রোমানদের তুলনা করে থাকেন, তাদের কাছে। এক্ষেত্রে (তাদের দিকে) প্রশ্ন ছুড়ে বলা যায় : "অতীতের রাজনৈতিক নীতিমালা এক হওয়া সত্ত্বেও, নব্য পশ্চিমাদের সাথে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এতটা ভিন্ন কেন?"

এর সহজ উত্তর হলো : উভয়ের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি কখনোই এক ছিল না। (ইসলামের সাথে রোমানদের) মিল খোঁজার ব্যাপারটি ইতিহাসের কালো অধ্যায়গুলোর একটি। ভাসা-ভাসা জ্ঞানের অধিকারী কিছু পশ্চিমারা বর্তমান প্রজন্মকে বহুকাল ধরে এটা গেলাচ্ছে।

বিস্তৃর্ণ এলাকা ও নানান জাতি-পেশার মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করার দিকটি বাদ দিলে, ইসলাম এবং রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে আর কোনো মিল নেই। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি চালিকাশক্তি এবং ভিন্ন ঐতিহাসিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে উভয়ের অস্তিত্ব টিকে ছিল। তা ছাড়া কাঠামোগত দিক থেকেও ইসলাম এবং রোম সাম্রাজ্যের বিস্তর ফারাক দেখা যায়। ভৌগলিক অগ্রগতি

---

[২৩] পশ্চিমা সভ্যতা পদে পদে রোমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই যেমন সপ্তাহের প্রতিটি দিনের কথাই ধরুন। এগুলোর সাথে রোমান পৌত্তলিকতার সম্পর্ক খুব গভীর। Saturday বা শনিবার শব্দটির উৎপত্তি Saeterndaeg থেকে। এর মানে হলো Satuern এর দিবস। Satuern কে ছিল জানেন? রোমানদের কৃষিদেবতা। আবার শুক্রবার বা Friday শব্দটি এসেছে Frigedaeg থেকে, যার মানে Frig এর জন্যে নির্ধারিত দিন। সৌন্দর্য ও ভালোবাসার দেবী ছিল ফ্রিগ। সে আবার দেবতা Woden এর স্ত্রী। এভাবে প্রতিটি দিনের নামের সাথেই জড়িয়ে আছে রোমানদের কোনো-না-কোনো দেবদেবীর নাম।

পশ্চিমা সভ্যতা ছিল ইহুদি-খ্রিস্টান জাতির সভ্যতা। কিন্তু ওরা ঈসা (আলাইহিস সালাম) বা যিশুর শিক্ষাকে বিকৃত করেছে। রোমানদের পৌত্তলিক সভ্যতার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছে। তৎকালীন রোমান দেবতাদের আকৃতি ছিল মানুষের মতো। স্রষ্টার এই মানবধর্মী ধারণাকে তারা যিশুর বেলাতেও প্রয়োগ করে। যিশুকে বানিয়ে ফেলে রক্তমাংশের ঈশ্বর বা মানব-দেবতা। আর সমবেত উপাসনার দিন সাবাত বা শনিবারের বদলে নির্ধারণ করা হয় রবিবারকে। কারণ, রোমানদের শীর্ষদেবতা জুপিটারের পুত্র অ্যাপোলোকে উপাসনা করা হতো এই দিনেই। অপরদিকে দলিল-প্রমাণ ছাড়াই ২৫ ডিসেম্বরকে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন সাব্যস্ত করা হয়। এর পেছনেও রয়েছে রোমান প্রভাব। ২৫ ডিসেম্বরকে রোমানরা 'অজেয় সূর্যের জন্মদিন' (Natalis Solis Invicti) হিসেবে পালন করত। [বিলাল ফিলিপস, *সভ্যতার সংকট*, পৃ. ২২-২৪] এভাবেই পশ্চিমাদের দর্শন আস্তে আস্তে পৌত্তলিক ও বস্তুবাদীতায় রূপ নেয়। এর পেছনে আঁতুরঘর হিসেবে কাজ করে রোমান সভ্যতা। - (অনুবাদক)

ও রাজনৈতিক পরিপক্কতা অর্জন করতে রোমানরা সময় নিয়েছিল এক হাজার বছর। অথচ ইসলামি সভ্যতা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল মাত্র আশি বছরের ব্যবধানে। উভয়ের স্থায়িত্বকাল হিসেব করলে আরও অবাক হতে হয়। হান[২৪] এবং গথ[২৫] সম্প্রদায়ের অভিযান রোমানদের পতনকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, এক শতাব্দীর মধ্যেই তার অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়। তাদের সাহিত্য এবং স্থাপত্যকলা ছাড়া আর কোনো কিছুই বর্তমান থাকেনি।

(এরপর উত্থান ঘটে) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের। এই সাম্রাজ্যকে রোমানদের একমাত্র উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, এটি প্রাচীন রোমের অধীনে থাকা কিছু অঞ্চলের ওপর তার শাসন কায়েম করতে পেরেছিল। কিন্তু এর সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে রোমের শাসনব্যস্থার মিল ছিল খুবই সামান্য। অন্যদিকে ইসলামি সাম্রাজ্য—যাকে খিলাফত হিসেবে রূপায়িত করা হয়—বিশাল সময় ধরে উত্থান-পতন এবং (ক্ষমতার) পট-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু তার বিধি-ব্যবস্থা একই থেকেছে সব সময়। বহিরাগত আগ্রাসন, এমনকি মঙ্গোলদের আক্রমণের সময়েও খিলাফতের সমাজ-কাঠামো এবং নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ভিত টলে যায়নি। অথচ রোমান সাম্রাজ্যের ওপর হান কিংবা গথদের চালানো ভয়াবহ হামলার চেয়েও মঙ্গোলদের আক্রমণ ছিল বেশি খতরনাক। তবে এই আক্রমণ অবশ্য অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পদস্খলনে দারুণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু রোমানদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়—ওদের পতন হতে সময় লেগেছিল প্রায় একশো বছর। অপরদিকে ইসলামি খিলাফত বিলীন হয়েছিল দীর্ঘ এক হাজার বছরের ব্যবধানে। এর ইতি ঘটেছিল

---

[২৪] হানদের উৎপত্তি কোথায়, এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এরা এসেছে কাজাখাস্তান থেকে। এরা ছিল পশুপালক যাযাবর জাতি। সর্দার আতিলার নেতৃত্বে হানরা ৩৭৩-৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, প্রায় আশি বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালায়। সশস্ত্র আক্রমণ রোমান সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেয়। এরা মধ্য ইউরোপে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলে। [*Encyclopædia Britannica*, ১১/৯৩২] - (নিরীক্ষক)

[২৫] গথ হলো জার্মান জাতির একটি গোত্র যা দুইটি শাখায় বিভক্ত—অস্ট্রগথ ও ভিজিগথস। এই গোত্রটি শত বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্যে লুটতরাজ চালিয়ে ছিল। [*Encyclopædia Britannica*, ১২/২৭৩] - (নিরীক্ষক)

উসমানি খিলাফতের রাজনৈতিক পরাজয়ের মাধ্যমে। মূলত এরই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে (ইসলামি) সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরে। যার চাক্ষুষ সাক্ষী আজ আমরা।

এসব ঘটনা আমাদেরকে এই উপসংহারে আসতে বাধ্য করে যে, মানুষের দেখা তাবৎ সমাজব্যবস্থার চেয়ে ইসলামি খিলাফতের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং সামাজিক গভীরতা বেশি মজবুত। চীনা সভ্যতাও বহু শতাব্দী ধরে দাপট দেখিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু (ইসলামের) সাথে তার কোনো তুলনাই চলে না। চীন (এশিয়া) মহাদেশের এক প্রান্তে অবস্থিত। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগেও—আধুনিক জাপানের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত—এটি ছিল বিরোধী শক্তির ধরাছোঁয়ার বাইরে। অবশ্য মঙ্গোলদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন, চেঙ্গিস খান ও তার অনুসারীরা চীনা সীমান্তের আশপাশ দখল করে নিয়েছিল। অন্যদিকে ইসলামি খিলাফতের বিস্তৃতি ছিল তিন মহাদেশ জুড়ে। আর এটি সব সময় তুলনামূলক শক্তিশালী ও খতরনাক শত্রু দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই নিকট-প্রাচ্য[২৬] ও মধ্যপ্রাচ্য[২৭] ছিল বিভিন্ন জাতি এবং সাংস্কৃতিক শক্তির রণক্ষেত্র। কিন্তু বরাবরই ইসলামি সমাজব্যবস্থা ছিল সেখানকার অপরাজেয় শক্তি। যা আজও বিদ্যমান। এই বিস্ময়কর দৃশ্যপট ব্যাখ্যা করার জন্যে আমাদের দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই অভিজাত সামাজ-কাঠামোর মজবুত ভিত্তি হচ্ছে কুরআন। আর মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ একে দিয়েছে টেঁকসই বন্ধন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্যে রোমান সাম্রাজ্যের কাছে ছিল না কোনো আধ্যাত্মিক উপাদান। যার ফলে এটা খুব দ্রুতই বিলীন হয়ে যায়।

এই প্রাচীন সাম্রাজ্য দুটোর মধ্যে আরও কিছু তফাত রয়েছে। ইসলামি

---

[২৬] সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগর এবং ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী দেশসমূহকে নিকট-প্রাচ্য বা Near East বলা হয়। তবে এর অবস্থান নিয়ে Britannica, National Geographic, আমেরিকার Department of State এবং, জাতিসংঘের মধ্যে মতবিরোধ আছে। - (অনুবাদক)

[২৭] ১৮৫০ সালের দিকে ব্রিটিশরা এই পরিভাষাটির ব্যবহার শুরু করে। ইরান, এশিয়া মাইনর, মেসোপোটেমিয়া, লেভান্ট, মিশর-এর অন্তর্ভুক্ত। প্রায় ১৮ টি আধুনিক রাষ্ট্র এই অঞ্চলে অবস্থিত। যার মধ্যে আছে মিশর, ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ইত্যাদি। - (অনুবাদক)

খিলাফতে কোনো গোষ্ঠীকেই বিশেষ নাগরিক সুবিধা দেওয়া হতো না। আর ইসলামের ঝাণ্ডাধারী ব্যক্তিরা ওই আদর্শকেই ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, যেটাকে তারা মহিমান্বিত সত্য বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের মূলমন্ত্র ছিল শাসনক্ষমতা এবং অন্য জাতিকে শোষণের মাধ্যমে নিজের মাতৃভূমিকে সমৃদ্ধ করা। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্যে রোমানরা বর্বরতা চালাতে কোনোরূপ দ্বিধা করত না। অন্যায়কে অন্যায় মনে করত না। ইতিহাসখ্যাত 'রোমের ন্যায়বিচার' শুধু রোমানদের জন্যেই বরাদ্দ ছিল। এ-থেকে স্পষ্ট হয়, নীরেট বস্তুবাদী চিন্তাধারার ওপর জীবন-সভ্যতা গড়ে উঠলেই কেবল এই ধরনের (বর্বর) দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা সম্ভব। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শৈল্পিক মোড়কে ঢাকা এই ধরনের বস্তুবাদী আদর্শের সাথে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের কোনো সম্পর্ক থাকে না। 'ধর্ম' জিনিসটা কী, আদতে রোমানরা তা জানত না। তাদের প্রচলিত 'দেব-দেবীরা' ছিল গ্রিক পুরাণের অনুকরণ মাত্র। নিছক সামাজিক রীতিনীতির সুবিধার্থে এই নিস্তেজ প্রেতাত্মাগুলোকে তারা মেনে নিয়েছিল। বাস্তব জীবনে এসব ঈশ্বরদের কোনো ভূমিকাই ছিল না। পরামর্শের দরকার হলে, তারা পুরোহিতদের মাধ্যমে পাওয়া দৈববাণীর সাহায্য নিত। কিন্তু মানুষদের ওপর নৈতিক বিধান আরোপ কিংবা তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এই দৈববাণীর ছিল না।

রোমানদের এসব নীতির ওপর ভর করেই আধুনিক পশ্চিমা সমাজ বিকশিত হয়েছে। ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া রোমের সংস্কৃতিকে তারা ছড়িয়ে দিয়েছে জীবনের পরতে পরতে। চলার পথে এটি আরও অনেকের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও বর্তমান জমানার পশ্চিমা রীতিনীতি এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি—সরাসরি প্রাচীন রোমান সভ্যতার প্রতিচ্ছবি। রোমের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক পরিবেশ যেমন আপাদমস্তক ভোগবাদী এবং ধর্ম-বিদ্বেষী ছিল, আধুনিক পশ্চিমাদের হালচাল অনেকটাই সেরকম।

আসমানি ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ দাঁড় করতে না পেরে, ক্ষেত্রবিশেষে প্রমাণের দিকটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, কেবলমাত্র সামাজিক ঐক্যের জন্যে পশ্চিমা চিন্তাধারায় ধর্মকে বরদাস্ত করা হয়। কিংবা মাঝেসাঝে এর

প্রতি গুরুত্ব দেখানো করা হয়। কিন্তু আসমানি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে রাখা হয় বাস্তব জীবনের বাইরে। স্রষ্টার অস্তিত্বকে পাশ্চাত্য সভ্যতা সরাসরি অস্বীকার করে না। তবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে স্রষ্টার কোনো স্থান বা প্রয়োগ নেই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক দিককে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করার গ্যাঁড়াকলে পড়ে, তারা নিজেরাই একটি নৈতিক মানদণ্ড বানিয়ে নিয়েছে। এ কারণেই, পশ্চিমা বিশ্ব এমন সব চিন্তা-চেতনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়, যেগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। অথবা মানুষের সামাজিক জীবনে বাস্তব প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু এ দুটো ক্ষেত্রেই স্রষ্টার অস্তিত্বের তেমন কোনো জরুরত নেই। তাই পশ্চিমা চিন্তাধারা জীবনের বাস্তব আঙিনায় স্রষ্টাকে পাশ কাটিয়ে চলাকে বেশি পছন্দ করে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে : "খ্রিস্টীয় চিন্তাধারার সাথে এই ধরনের কর্মপন্থা কিভাবে সমঝোতা করতে পারে? পশ্চিমাদের রুহানি জগতের মৌলিক উৎস হিসেবে যে খ্রিস্টবাদকে দায়ী করা হয়, সেটা কি আসমানি নীতিশাস্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়?"

হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতাকে খ্রিস্টবাদের ফল মনে করাটা, মোটাদাগে একটা ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নব্য পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক স্তম্ভ আসলে প্রাচীন রোমান সভ্যতা। আর ওদের কাছে জীবন মানেই ভোগ-বিলাস। আসমানি নীতিশাস্ত্রের কোনো গুরুত্ব সেখানে নেই। তাদের এই ধারণাকে এভাবে বর্ণনা করা যায় : "জীবনের উৎপত্তি এবং শরীরের মৃত্যুর পর কী ঘটবে, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। তাই অবৈজ্ঞানিক নীতিশাস্ত্র দিয়ে জীবনকে বিষিয়ে না তুলে, বাহ্যিক উন্নতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনার পেছনে সর্বশক্তি নিয়োগ করাই শ্রেয়।"

নিঃসন্দেহে পশ্চিমা সভ্যতার এমনতরো দৃষ্টিভঙ্গি খ্রিস্টবাদ, ইসলাম এবং অন্যান্য সকল ধর্মের কাছে অগ্রহণযোগ্য। কেননা, এমন ধারণা ধর্মীয় বিশ্বাসের পুরোপুরি বিপরীত। সুতরাং খ্রিস্টবাদের কারণে পশ্চিমারা বস্তুগত

উন্নতি সাধন করেছে, এই দাবি নিতান্তই অমূলক। বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও পার্থিব উৎকর্ষতায় পশ্চিমারা আজ সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর পেছনে খ্রিস্টধর্মের ভূমিকা খুবই অল্প।[২৮] খ্রিস্টানদের গির্জা এবং জীবন সম্পর্কে গির্জার দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম। এর ফলেই ইউরোপের উত্থান ঘটেছে।

শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ইউরোপের চিন্তাধারা এমন একটি ধর্মীয় মতবাদ দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছিল, যা মানুষের ফিতরাতকে ঘৃণার চোখে দেখত। গসপেলের[২৯] প্রতিটি অধ্যায় জুড়ে থাকা বৈরাগ্যবাদের ফিরিস্তি, অন্যায়ভাবে থাপ্পর খাওয়ার পরেও নত হওয়া এবং 'নিজের অন্য গাল পেতে দেওয়া'[৩০],

---

[২৮] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ৪ নং পাদটীকা)** : অপরদিকে ইনসাফের খাতিরে এটাও বলা জরুরি যে, বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলা যেমন : চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য, এর পাশাপাশি পাশ্চাত্যের সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতকে খ্রিস্টান চার্চ খুবই ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। চার্চ কেবল প্রেরণার উৎস হিসেবেই কাজ করেনি, সেই সাথে এর গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকও ছিল।

[২৯] যোহন, মথি, মার্ক, লুক—এই চারজন চারভাবে যিশুখ্রিস্টের শিক্ষাগুলো বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে বলা হয় গসপেল (Gospel)। বাইবেলের নতুন নিয়মে এই চারটি গসপেলই আছে। কিন্তু এই গসপেলগুলো যারা লিখেছেন, তারা কেউই যিশুর সাক্ষাৎ পাননি। তবে বাইবেল দাবি করে, সুসমাচার লেখক মথি (Matthew) যিশুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। সবচেয়ে মজার কথা হলো, যিশু ও শিষ্যদের ভাষা ছিল সুরিয়ানি। অথচ এই গসপেলগুলোর একটাও সুরিয়ানি ভাষার নয়। পশ্চিমাদের দাবি অনুযায়ী, এগুলো প্রাচীন কোইনে গ্রিক (Koine Greek) ভাষার। তাদের নিকট স্বীকৃত গসপেলগুলোর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির ভাষাও এটিই। সাধু পলের অনুসারীরা এইসব গ্রিক গসপেল মান্য করে। ১ম শতাব্দীর একত্ববাদী Ebionite খ্রিস্টানরা হিব্রু/এরামায়িক গসপেল পড়ত। কিন্তু তারা বহু আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে এইসব গসপেল আসলেই যোহন, মথি, মার্ক কিংবা লুক নিজে লিখেছেন কি না, এই ব্যাপারেও মতভেদ আছে। নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, এগুলো তাদেরই রচনা। এই কিতাবগুলোর মধ্যে আবার আছে শত শত বৈপরীত্য। [বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন : রহমাতুল্লাহ কীরানবী, *ইযহারুল হক*, ১/১৩৫-১৪০] - (অনুবাদক)

[৩০] যদি ক্ষমা, ধৈর্য, স্নেহ, মমতা দিয়ে বদ চরিত্রের লোকদের সংশোধন করা যায়, তবে তাই করতে হবে। কিন্তু যদি ভালোবাসা এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, তখন কাজে লাগাতে হবে প্রতিশোধ, শাস্তি ও শাসনের হাতিয়ার। কিন্তু যিশু কেবল একপাক্ষিক উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের বলছি, কোনো দুষ্ট ব্যক্তির প্রতিরোধ কোরো না। কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তোমার অন্য গালও তার দিকে বাড়িয়ে দাও। আর কেউ যদি তোমার জামা নিয়ে নেওয়ার জন্যে তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে চায়, তাকে তোমার চাদরও নিতে দিয়ো। কেউ যদি তোমাকে এক কিলোমিটার যাওয়ার জন্যে জোর করে, তুমি তার সঙ্গে দুই কিলোমিটার যাও।"

আদম এবং ইভের স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কারণ হিসেবে 'যৌনতা'-কে দায়ী করা, আদিপাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে যিশুর ক্রুশে ঝুলা[৩১]—এগুলো জীবনকে মঙ্গলময় হিসেবে উপস্থাপন করে না। বরং সব ক্ষেত্রকেই করে তোলে অভিশপ্ত। এটি যেন আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে একটি জগদ্দল পাথরের মতো। পষ্টতই বোঝা যায়, জাগতিক জ্ঞান নিয়ে মাথা খাটানো এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখার বিষয়টি খ্রিস্টবাদ ভালো চোখে দেখে না। মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই ধরনের অন্ধবিশ্বাস, ইউরোপের চিন্তা-চেতনাকে বহুকাল ধরে দমিয়ে রেখেছিল। মধ্যযুগে গির্জার যখন দুর্দান্ত প্রতাপ, সে-সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ইউরোপের তেমন কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায় না। ইউরোপের সংস্কৃতি যে-উৎস থেকে বিকশিত হয়েছিল, সেই রোমান ও গ্রিক দর্শনের কৃতিত্বের সাথে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না।

মানুষের মনন বিদ্রোহ করেছিল বহুবার। কিন্তু বরাবরই গির্জা তাদেরকে দমিয়ে রেখেছে। ইউরোপের প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ এবং গির্জার মধ্যকার তিক্ত দ্বন্দ্বের কাহিনী দিয়ে মধ্যযুগের ইতিহাস ভরপুর। খ্রিস্টান চার্চ ইউরোপের মন-মগজকে আবদ্ধ করে রেখেছিল বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের জালে। এই দাসত্ব থেকে তারা মুক্তি লাভ করে রেনেসাঁসের সময়।[৩২] ওদিকে আরবদের

[মথি, ৩৯-৪১] – (অনুবাদক)

[৩১] প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ যিশুর শিক্ষা নয়, এটা মূলত সাধু পৌলের প্রচারিত মতবাদ। এই মতবাদে বলা হয়েছে, মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে যিশু ক্রুশে ঝুলে আত্মাহুতি দিয়েছেন। এটা স্বীকার করে নিলে বলতে হয় : খুন-হত্যা, চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, জুলুম-নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ করা সত্ত্বেও একজন মানুষের স্বর্গে যেতে কোনো বাধা থাকবে না। শুধু যিশুর ওপর ঈমান রাখলেই হলো। কিন্তু এই নীতি মেনে নিলে, যিশুর সমস্ত নৈতিক উপদেশ অকার্যকর হয়ে পড়ে। অপরাধ করলে মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যিশুর এই জাতীয় বাণীর কোনো মূল্য থাকে না। তাই প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ সত্য হলে, যিশুর উপদেশগুলো মিথ্যা হতে বাধ্য। - (অনুবাদক)

[৩২] মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ইতালিতে সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে পেট্রার্ক, বোকাশিও প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই নবযুগের পথে কলম ধরেন। চিত্রকলায় এই যুগের উত্থান ঘটান রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রমুখ। তাদের প্রভাব ছড়িয়ে যায় গোটা ইউরোপ জুড়ে। দর্শনের ক্ষেত্রে এই নতুন চিন্তাধারা খুঁজে পাওয়া যায় কজার নিকোলাস, ব্রুনো, কামপানেলা প্রভৃতির দার্শনিকের রচনায়। আস্তে আস্তে ইউরোপীয় সভ্যতা হয়ে ওঠে ধর্মহীন ও বস্তুবাদী। [*পরিভাষা কোষ*, পৃ. ১৮০-৮১, *দর্শনকোষ*, পৃ. ৩৩৩]

সাংস্কৃতিক আবহ এবং চিন্তা-চেতনা বহু শতক ধরে বিস্তার লাভ করতে থাকে পশ্চিমা সমাজে। এর বদলৌতে (বিপ্লব) ছড়িয়ে যায় বিস্তৃর্ণ পরিসরে।

প্রাচীন গ্রিস এবং পরবর্তীকালের হেলেনিস্টিক[৩৩] যুগে যেসব চমৎকার সংস্কৃতি ছিল, আরবরা সেগুলো অধ্যয়ন করতে থাকে। ইসলামি খিলাফতের প্রাথমিক যুগে তারা এর উৎকর্ষ সাধন করে। হেলেনিস্টিক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ আরববিশ্ব এবং মুসলিম উম্মাহর জন্যে যে সার্বিক কল্যাণ বয়ে এনেছিল, আমি তা বলছি না। কারণ, এটা ঘটেনি। হেলেনিস্টিক সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামের আকীদা ও ফিকাহশাস্ত্রে এরিস্টটল[৩৪] এবং নব্য প্লেটোবাদী[৩৫] চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। এটা ছড়িয়ে পড়ে গোটা আরব-বিশ্বে এবং ইউরোপীয় চিন্তাধারায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

মধ্যযুগ ইউরোপের জাগরণ-শক্তিকে একেবারে স্তিমিত করে ফেলেছিল।

– (অনুবাদক)

[৩৩] গ্রিকদের বিখ্যাত বীর আলেজান্ডার থেকে নিয়ে অগাস্টাসের মধ্যবর্তী সময়কে হেলেনেস্টিক যুগ বলা হয়। এই সময়ে জ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে গ্রিকরা সকলকে ছাড়িয়ে যায়। – (অনুবাদক)

[৩৪] এরিস্টটলের মতে, প্রতিটি বস্তরই তিনটি রূপ আছে—বস্তুত্ব, আকার ও গতি। বস্তুত্ব একদিকে গতিহীন, কিন্তু বস্তুত্বের মধ্যে বস্তুর আকার, গতি ও লক্ষ্য নিহিত আছে। তাই বলে বস্তুর আকার এবং বস্তুত্ব এক জিনিস নয়। আকার ব্যতীত বস্তু কল্পনা করা যায় না। আকারই বস্তুকে উপলব্ধির যোগ্য করে তোলে। এই কারণে, আকার অবশ্যই অধিকতর সত্য এবং চিরন্তন। কিন্তু বস্তুর পরিবর্তন বা ক্ষয় আছে, আকারের ক্ষয় নেই। আকার অনুযায়ী আমরা বস্তুকে উপলব্ধি করি, কিন্তু বস্তু অনুযায়ী আকারকে নয়। প্রকৃতির রহস্য তালাশ করার ক্ষেত্রে এরিস্টটলের মতামত প্রধানত বস্তুজগৎ এবং বাস্তব জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিছক কল্পনার ওপরে নয়। কিন্তু তার শিক্ষক প্লেটোর ভাববাদী দর্শন তিনি পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেননি। এ কারণে, তার দর্শনে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের মিশ্রণ দেখা যায়। [*দর্শনকোষ*, পৃ. ৬৬] – (অনুবাদক)

[৩৫] ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্লেটোর ভাববাদের একটি রূপান্তর ঘটে। একেই 'নব্য প্লেটোবাদ' (Neo-Platonism) বলা হয়। এর সূত্রপাত ঘটে তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে। তাই একে 'আলেকজান্দ্রিয়ার প্লেটোবাদ' নামেও ডাকা হয়। বস্তুজগৎকে মূল ভাবের এক রহস্যময় প্রকাশ বলে গণ্য করা হয় এই দর্শনে। আসল ভাব বা সত্তার বিকাশ ঘটে পর্যায়ক্রমে। এর একেবারে নিম্নতম স্তরের প্রকাশ হলো বস্তুজগৎ। এর উর্ধ্বে হচ্ছে বিশ্ব-আত্মা। বিশ্ব আত্মাকে অতিক্রম করে রুহ। এর ওপরে হচ্ছে পরমাত্মা। মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় দর্শনের বিকাশে এই মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান এই মতবাদ উচ্ছেদ করেন। [*পরিভাষা কোষ*, পৃ. ১৩৯, *দর্শনকোষ*, পৃ. ২৯২-৯৩] – (অনুবাদক)

বিজ্ঞান ছিল স্থবির অবস্থায়, কুসংস্কার ছিল তুঙ্গে, সমাজব্যবস্থা এতটাই সেকেলে এবং বর্বর ছিল যে, আজ তা কল্পনা করা দায়।[৩৬] ঠিক ওই সময়ে পূর্ব প্রান্তে ক্রুসেডারদের আক্রমণ আর পশ্চিমে স্পেন এবং সিসিলিতে মুসলিমদের গৌরবময় বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্যের কারণে ইসলামি সংস্কৃতির প্রভাব (ইউরোপে) ছড়িয়ে পড়ে।[৩৭] পরবর্তীকালে নিকট-প্রাচ্যের সাথে জেনোয়া প্রজাতন্ত্র[৩৮] ও ভেনিসের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রভাব, ইউরোপীয় সভ্যতার বন্ধ দুয়ারে করাঘাত করে। ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের সামনে চোখ ধাঁধানো এক সভ্যতা এসে দাঁড়িয়ে যায়। যার ছিল পরিশুদ্ধ, উন্নয়নশীল ও পূর্ণ উদ্যমী এক জীবনধারা। এমন সব সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার তার ছিল, যা ইউরোপ খুইয়ে ফেলেছিল এবং ভুলে গিয়েছিল অনেক আগেই।

আরবরা স্রেফ প্রাচীন গ্রিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করেনি। তারা নিজেদের জন্যে বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তের সূত্রপাত ঘটায়। জ্ঞান-গবেষণা ও দর্শনকে নিয়ে যায় এক অনন্য উচ্চতায়। (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে এসব ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমা বিশ্বে। বলাই বাহুল্য, তথ্য-প্রযুক্তির যে নয়া জমানায় আমরা বাস করছি, তার সূচনা খ্রিস্টীয় ইউরোপের কোনো শহরে হয়নি। এর সূত্রপাত হয়েছিল দামিশক, কায়রো, বাগদাদ, কর্ডোভা, নিশাপুর ও সমরকন্দের মতো ইসলামি মার্কাজে। ইউরোপীয়দের মাঝে এসব বিপুল পরিমাণে সাড়া ফেলে। ইসলামি সভ্যতার সান্নিধ্যে এসে পশ্চিমের আকাশে উদিত হয় এক নতুন সূর্য। নবজীবন এবং উন্নতির অধীর

---

[৩৬] Iron Maiden বানিয়ে খুঁচিয়ে মারা, Scold's Bridle মাথায় পড়িয়ে বাজারে হাঁটানো, Breast Ripper দিয়ে নারীদের স্তন ছিন্নভিন্ন করে ফেলা, Heretic's Fork লাগিয়ে থুতনি গলা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া, Wooden horse এর ওপর বসিয়ে যোনি ছিন্নভিন্ন করে ফেলা, Spanish Boot এর প্যাঁচ কষে নারীর কোমল পা নীল করে দেওয়া, ইত্যাদি ছিল ওই সময়কার সাধারণ ঘটনা। ১৪৫০-১৭৫০ সাল পর্যন্ত ডাইনি-নিধনের নামে ৫-৭ লাখ মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়, যাদের ৮০% ছিল নারী। - (অনুবাদক)

[৩৭] মুসলিমরা স্পেন জয় করে তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে ৭১২ সালে। স্পেনকে আরবরা ডাকত আন্দালুস নামে। আর 'সিসিলি' ইতালির উত্তরে ও তিউনিশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দ্বীপ। মুসলিমরা সিসিলি জয় করে ৮২৮ খ্রিস্টাব্দে। [ইসমাইল রাইহান, *মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ*, ৬/৯৯-১১৮; ৯/২৪] – (অনুবাদক)

[৩৮] ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল, যা ইতালির উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। - (অনুবাদক)

আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে। ইউরোপীয় ইতিহাসবিদরা কেবল এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সময়টাকে 'রেনেসাঁস' বা পুনর্জন্ম আখ্যা দেননি। সত্যিকার অর্থেই এটা ছিল ইউরোপের পুনর্জাগরণ।

ইসলামি সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত নতুন ধারা ইউরোপের ক্ষুরধার মেধার অধিকারী লোকদেরকে এক নতুন শক্তি দান করে। এর ফলে গির্জার সর্বনাশা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তারা লড়াই শুরু করে। এই বিবাদের গোড়ার দিকে যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে গোটা ইউরোপ জুড়ে। যার উদ্দেশ্য ছিল, পাশ্চাত্যের নতুন চিন্তাধারাকে বাইবেলের ব্যাখ্যার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এই আন্দোলন তার আপন গতিতে চলতে থাকে। এর মাধ্যমে যদি সত্যিই সাফল্যের দেখা মিলত, তাহলে হয়তো ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার সমন্বয় ঘটত। কিন্তু মধ্যযুগে গির্জার ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ এতদূর গড়িয়েছিল যে, নিছক সংস্কারের মাধ্যমে তার সুরাহা করাটা ছিল অসাধ্য কাজ। তা ছাড়া, খুব শীঘ্রই আগ্রহী দলগুলোর মাঝে রাজনৈতিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে সংস্কার হওয়ার বদলে খ্রিস্টবাদ রূপ নেয় রক্ষণশীলতায় এবং অনবরত কৈফিয়ত পেশ করতে থাকে।

আসলে ঘনঘন মত বদলানোর স্বভাবটি ক্যাথলিক কিংবা প্রটেস্ট্যান্ট গির্জা কখনো ছাড়তে পারেনি। দুর্বোধ্য অন্ধবিশ্বাস, বৈরাগ্যবাদ, জালিম শাসকের প্রতি নির্লজ্জ সমর্থন থেকে এরা একটুও পিছু হটেনি। বরং মনগড়া ব্যাখ্যা আর ফাঁপা বুলি আওড়ানোর মাধ্যমে, গির্জা তার সীমাহীন ব্যর্থতাকে সব সময় আড়াল করতে চেয়েছে। তাই সময় গড়ানোর সাথে সাথে ইউরোপে ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রভাব দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। এটা হওয়ারই ছিল। শেষতক আঠারো শ শতাব্দীতে ফ্রান্সের শিল্পবিপ্লব এবং অন্যান্য দেশগুলোর ওপর এর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবের কারণে, গির্জার আধিপত্য একেবারে নিঃশেষ যায়। ঠিক তখনি মধ্যযুগের মুমূর্ষু ধর্মীয় অনুশাসনের হাত থেকে বেরিয়ে এসে, পুনরুজ্জীবিত এক নতুন সভ্যতা হিসেবে ইউরোপ নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

১৮শ শতকের শেষ এবং ১৯শ শতকের গোড়ার দিকের কথা। এই সময়ে

দর্শন, চারুকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে প্রভাবশালী কিছু ইউরোপীয়ানদের দেখা আমরা পাই। কিন্তু এটা কেবল অল্প-সংখ্যক ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয়ান এমন এক ধর্মীয় মতবাদের গ্যাঁড়াকলে আটকা পড়েছিল, যা মানুষের ফিতরাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই ধর্মের শেকল খুলে যাওয়ার পর, সত্যিকার অর্থে ইউরোপীয়রা আর কখনোই ধর্মীয় অনুশাসনের দিকে ফিরে যায়নি। যেতে পারেনি।

'যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র'—এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা ইউরোপের ধর্মীয় পুর্নজাগরণকে বোধহয় সবচেয়ে বেশি ব্যহত করেছিল। অবশ্য দার্শনিক চিন্তাধারা লালনকারী খ্রিস্টানরা এটাকে কখনো আক্ষরিক অর্থে নেননি। তারা একে ঈশ্বরের দয়ার একটি 'মানবীয় নিদর্শন' হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সবাই তো আর দার্শনিক ছিল না! বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান 'পুত্র' কথাটিকে আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বাস করত। যদিও এর সাথে সব সময় আধ্যাত্মিক রস মিশ্রিত ছিল। 'যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র', এই বিশ্বাস তাদেরকে—মানুষের আকৃতিতে স্বয়ং ঈশ্বর (দুনিয়ায় এসেছেন, এই ধারণার) দিকে নিয়ে যায়। (যিশুকে) তারা ঢেউ-খেলানো দাড়িযুক্ত এক সৌম্য বৃদ্ধের আকৃতি প্রদান করে। মূল্যবান শৈল্পিক চিত্রের মাধ্যমে এই আকৃতিকে স্থায়ীভাবে গেঁথে দেওয়া হয় ইউরোপীয়দের অবচেতন মনে।

মানুষের রূপ ধারণ করেছেন ঈশ্বর, (তিনিই আবার যিশুখ্রিস্টের) পিতা! গির্জার এই অন্ধবিশ্বাস একসময় গোটা ইউরোপ দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। তখন এই অদ্ভুত ধারণার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। মানবরূপী স্রষ্টার ধারণা জনমনে তখন আসন গেড়ে বসেছিল। কিন্তু মধ্যযুগে এসে অন্ধভক্তির শেকল ভেঙে গেলে, ইউরোপের চিন্তাশীল মানুষরা কোনোভাবেই এই ধারণার সাথে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না।

এনলাইটেনমেন্ট[৩৯]-এর পরবর্তী সময়ে স্রষ্টা সম্পর্কে গির্জার প্রচারিত শিক্ষা

[৩৯] অষ্টাদশ শতক। একেই এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়নের যুগ বলা হয়। এই সময়ে ইউরোপের মানুষ কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে পেছনে ফেলে বস্তুবাদী উন্নতির দিকে যাত্রা শুরু করে। - (অনুবাদক)

থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন ইউরোপীয় চিন্তকরা। কিন্তু তারা তো (স্রষ্টা-সম্পর্কিত) এই একটি ধারণার সাথেই পরিচিত ছিলেন। (আর এটি মনঃপূত না হওয়ায়) তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে শুরু করেন। সাথে সাথে ধর্মকেও। অপরদিকে শিল্পযুগের তাক-লাগানো বস্তুগত উন্নতির পথ ধরে, উদিত হয় এক নতুন সূর্য। যা মানুষকে নতুনত্বের দিকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। এর ফলে সৃষ্টি হয় ধর্মীয় শূন্যতা।

এই শূন্যতার ছুতা দিয়ে পশ্চিমাদের উন্নতির যাত্রা একটি দুঃখজনক মোড় নেয়। দুঃখজনক অবশ্য তাদের জন্যে, যারা ধর্মকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করে থাকেন। ত্রিত্ববাদী[৪০] খ্রিস্টধর্মের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে পশ্চিমারা সব ধরনের (ধর্মীয়) চিন্তার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে সকল প্রকার রুহানি জিনিস অস্বীকার করার বিষয়টি প্রবল আকার ধারণ করে। 'আবারও ছড়িয়ে পড়বে চার্চের লোকদের দুঃশাসন'—এই ধরনের সুপ্ত ভয় কাজ করতে থাকে। ফলে রীতিনীতি এবং কাজেকর্মে সর্বদা ধর্মবিরোধী অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপ সকলকে ছাড়িয়ে যায়। এভাবেই সে ফিরে যায় প্রাচীন রোমান ঐতিহ্যে।

অন্যদের তুলনায় খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাসে এমন কোনো কারিশমা ছিল না, যার কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতা এই চোখ-ধাঁধানো বস্তুগত উন্নতি সাধন করেছে। এই ধরনের দাবি করলে অবশ্য কিছু বলার থাকবে না। কারণ, গির্জার রীতিনীতির বিরুদ্ধে তৎকালীন ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ছাড়া, এসব সাফল্য কখনো আলোর মুখ দেখত না। ইউরোপের নব্য বস্তুবাদী চিন্তাধারা মূলত খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ওপর নেওয়া একপ্রকার প্রতিশোধ। খ্রিস্টবাদ মানুষের ফিতরাত থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিল।

[৪০] ত্রিত্ববাদের বলা হয়েছে : পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা—এই তিনজনের প্রত্যেকেই ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্র-আত্মা ঈশ্বর। কিন্তু পিতা পুত্র নন, পুত্র পবিত্র আত্মা নন, পিতা পবিত্র আত্মা নন। কিভাবে সম্পূর্ণ তিনজন পৃথক ব্যক্তি একজন হলেন, তা কখনোই ত্রিত্ববাদীরা বুঝতে বা বোঝাতে পারেননি। হয়তো খ্রিস্টান প্রচারক আপনাকে বলবেন, মাংস, অস্থি ও রক্ত তিন বস্তু দিয়ে মানবদেহ; তেমনি পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মার সমন্বয়েই ঈশ্বর! সম্ভবত তিনি জানেনও না যে, এ কথা বলার সাথে সাথে ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস অনুসারে তিনি কাফির হয়ে গিয়েছেন! কারণ ত্রিত্ববাদে পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মা এক ঈশ্বরের তিন অঙ্গ বা অংশ নন। বরং প্রত্যেকেই পৃথক ঈশ্বর! (বিস্তারিত : ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *পবিত্র বাইবেল : পরিচিতি ও পর্যালোচনা*)

খ্রিস্টবাদের সাথে আধুনিক পশ্চিমাদের সম্পর্ক কী, এর গভীরে যাওয়া আমাদের মুখ্য বিষয় নয়। তবে ইউরোপীয় সভ্যতা কাজেকর্মে কেন এতটা ধর্ম-বিদ্বেষী হয়ে উঠল, তার নেপথ্যে থাকা তিনিটি মৌলিক কারণ তুলে ধরতে চাচ্ছি।

১) জীবন এবং আত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে রোমান সভ্যতার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এর যোগসূত্র।

২) খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে জনতার বিদ্রোহ। সহজাত প্রয়োজন ও বৈধ চেষ্টাকে দমিয়ে রাখার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম।[৪১]

৩) মানবীয় গুণাবলি স্রষ্টার ওপর আরোপ করা।

ধর্মের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ শতভাগ সফল হয়েছিল। এতটাই সফল হয়েছিল যে, ইউরোপের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নতুন অবস্থানের সাথে তাল মেলানোর জন্যে, অনেক মৌলবাদী খ্রিস্টান এবং গির্জা তাদের ধর্মবিশ্বাসে ধীরে ধীরে কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়।

ধর্মের মৌলিক দায়িত্ব হলো, অনুসারীদেরকে সমাজ-কাঠামো বাতলে দেওয়া। সমাজকে প্রভাবিত করা। তা না-করে, সহনশীল ধর্মমত ও রাজনৈতিক সংস্থার লৌকিক আবরণ হিসেবে খ্রিস্টবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। আজকাল বেশিরভাগ মানুষের কাছে এটা স্রেফ প্রথা হিসেবে বেঁচে আছে। যেমনটা জুটেছিল রোমান দেবতাদের ভাগ্যে—সমাজের ওপর সত্যিকার অর্থে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

অবশ্য পশ্চিমা বিশ্বে এখনো কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ আছেন, যারা সত্যিকার অর্থে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে চান। তারা তাদের সভ্যতার রীতিনীতিকে ধর্মবিশ্বাসের সাথে সমন্বয় করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পশ্চিমের গণতন্ত্রকামী, ফ্যাসিবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্যবাদী, বুদ্ধিজীবী কিংবা সাধারণ মানুষ—সকলেই কেবল একটি পরমধর্ম মেনে

[৪১] মানুষের চেষ্টা-প্রয়োজনকে দমিয়ে রাখার অংশ হিসেবে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতার অধিকারী লোকদের সাথে চার্চ গতানুগতিক সম্পর্ক গড়ে তুলত। আর ক্ষমতাশীলদের জুলুম-অত্যাচারে চুপচাপ সমর্থন দিত। - (লেখক)

চলছে। সেটা হলো, বস্তুগত উন্নতির আরাধনা। তারা বিশ্বাস করে, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার, কিংবা জীবনকে অনবরত সহজ করে তোলা ছাড়া মানুষের আর কোনো কাজ নেই। বিশাল বিশাল কারখানা, সিনেমা হল, রসায়নাগার, রঙ্গমঞ্চ, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি হলো এই ধর্মের মন্দির। আর ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ার, ফিল্মস্টার, অফিসার এবং বিশ্বজয়ী খেলোয়াড়রা হলো এই ধর্মের পুরোহিত।

এর অনিবার্য ফল হলো—'ক্ষমতার দ্বন্দ্ব' এবং 'সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী'। নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় একে-অপরকে খতম করার জন্যে তারা দিবানিশি উন্মাদ হয়ে থাকে। আর সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাদের মধ্যে এমন একদল লোকের উদ্ভব হয়েছে, যারা নৈতিকতা বলতে স্রেফ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকেই বোঝে। যাদের কাছে কল্যাণ-অকল্যাণের মাপকাঠি হলো পার্থিব সফলতা।

বর্তমান পশ্চিমা সমাজ নিবিড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যতই এগোচ্ছে, নিত্যনতুন ভোগবাদী চেতনা তার সামনে পষ্ট হচ্ছে। যান্ত্রিক দক্ষতা, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী চেতনা-সহ যেসব জিনিসের সাথে বস্তুগত উন্নতির যোগসাজস রয়েছে, সেগুলোকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। মানুষকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রেও এসব গুণাবলির সীমাহীন কদর করা হচ্ছে। অন্যদিকে (পিতামাতার প্রতি) সন্তানের ভালোবাসা, কিংবা অবাধ যৌনতার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া-সহ নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব গুণাবলির জরুরত ছিল, তার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। এগুলো তো আর সমাজের বস্তুগত উন্নতি সাধন করতে পারে না!

যে বয়সে কারও জন্যে পারিবারিক সান্নিধ্য ছিল খুবই জরুরি, সেটার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। 'দূরে থাকলে সম্পর্ক ভালো থাকে'—এই ধরনের চটকদার স্লোগান এর জন্যে দায়ী। যে সমাজ আদতে প্রযুক্তি-নির্ভর এবং যান্ত্রিকতার হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ত্বরিত গতিতে, সেখানে পিতার সাথে সন্তানসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার তেমন কোনো জরুরত নেই। আর আট-দশজন মানুষের সাথে যে ধরনের শালীনতা বজায় রাখতে হয়, স্রেফ ওটুকু দেখালেই চলে। তাই তো বাবার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাবোধ কমে যাচ্ছে। আর

দিনকে দিন পশ্চিমা পিতা তার সন্তানের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন। ধীরে ধীরে নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে তাদের পারিবারিক বাঁধন। এই যান্ত্রিক সমাজ একজনের ওপর আরেকজনের বিশেষ অধিকারকে[৪২] উৎখাত করছে তার নীতির দোহাই দিয়ে। পাশাপাশি ওটাকে প্রতিষ্ঠা করেছে সেকেলে চিন্তা-ভাবনা হিসেবে। এমন চিন্তাধারা লালন করার ফলে, পারিবারিক সম্পর্কের সূত্র ধরে যে বিশেষ অধিকার পাওয়া যেত, আজ সেটাও হারিয়ে হয়ে গিয়েছে।

একইভাবে যৌনতার ব্যাপারে পূর্ববর্তী নৈতিক অবস্থানকে শিথিল করে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমারা আজ যৌন বিধানগুলোকে খারিজ করে দিয়েছে। নৈতিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তো এসব মেনে চলতে হয়। কিন্তু (যান্ত্রিক সমাজ তো আর) নীতি-নৈতিকতার কোনো তোয়াক্কা করে না। কেননা, এর সাথে সরাসরি দুনিয়াবি ফায়দা জড়িত নেই। এর ফলে যৌন-সংযম খুব দ্রুত তার গুরুত্ব হারাচ্ছে। 'নিজ দেহের ওপর রয়েছে প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতা'—নব্য নৈতিকতা এমন চিন্তাধারা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে কেবল প্রসবকালীন সময় এবং বংশের বিশুদ্ধতা রক্ষা ছাড়া আর কোথাও যৌন বিধিনিষেধ থাকবে না।

পাশ্চাত্যের ধর্ম-বিদ্বেষ ও নৈতিক অবক্ষয় কিভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার[৪৩]

[৪২] সম্পর্কের গভীরতার ওপর ভিত্তি করে, ইসলামে অধিকার নির্ধারিত হয়। যার সাথে পারিবারিক সম্পর্ক বেশি কাছের, সে পাবে বেশি অধিকার। যেমন মা'র সাথে সন্তানের সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড়। আর সে জন্যেই মা তার সন্তানের কাছ থেকে পাবেন তিনগুণ বেশি অধিকার। আর পিতা পাবেন একগুণ। এক লোক রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার বাবা।' [বুখারি, আস-সহীহ, ৯/৫৫৪৬] পশ্চিমাদের কাছে এই ধরনের বিশেষ অধিকার বলে কিছু নেই। পশ্চিমা বিশ্বে ছেলে-মেয়ে মা-বাবাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য নয়। আবার মা-বাবাও সন্তানকে একটু আলাদা দৃষ্টিতে দেখবে, এটাও পাশ্চাত্যের নীতি-নৈতিকতার আওতার মধ্যে পড়ে না। অতি-নীকটাত্মীয়ের বিশেষ কোনো অধিকার তারা স্বীকার করে না। এগুলো তাদের কাছে সেকেলে ধারণা মাত্র। - (অনুবাদক)

[৪৩] লেখক যখন কিতাবটি লিখেছিলেন, তখন সোভিয়েত রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার পুরো নাম ছিল "Union of Soviet Socialist Republics" সংক্ষেপে USSR. ভ্লাদিমির লেনিনের হাত ধরে এটি ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৯১ সালে তা ভেঙে যায়। শেষমেশ সোভিয়েত রাশিয়া

বিপর্যয় ডেকে এনেছে, সেটি বেশ কৌতুহল-উদ্দীপক। সাংস্কৃতিক প্রগতির দিক থেকে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সাথে এর সামান্যতম ফারাক নেই। তা ছাড়া ধর্ম ও বৈরাগ্যবাদের প্রতি নব্য পশ্চিমাদের যে ধরনের বিদ্বেষ ছিল, তার চূড়ান্ত নমুনা ও বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিকদের গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপে। অবশ্য পুঁজিবাদী পশ্চিমা সভ্যতা এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যকার মৌলিক দ্বন্দ্বটা সবার কাছে পষ্ট। কারণ, এরা পথ চলে ভিন্ন গতিতে। কিন্তু অচিরেই হয়তো দেখা যাবে, তাদের মূল লক্ষ্য একই। খুব শীঘ্রই তাদের অন্তমিল পরিষ্কার হবে। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাকে একটি যান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর কাছে সঁপে দেওয়ার প্রবণতা, পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ এবং (রাশিয়ার) সমাজতন্ত্র—উভয়ের মাঝেই পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষকে এরা (যান্ত্রিক) চাকার খাঁজ ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। ধর্মীয় অনুশাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে-কোনো সমাজের জন্যে এই ধরনের সভ্যতা মারাত্মক ক্ষতিকর। এটাই হলো সারকথা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, সেখানে ইসলামি চিন্তাধারা লালন এবং সে অনুযায়ী বসবাস করা সম্ভব কি?—এটা হলো আমাদের প্রশ্ন।

যদি এর উল্টোটা জিজ্ঞেস করা হয়—(পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী কারও পক্ষে কি ইসলামি বিশ্বে বাস করা সম্ভব)?

উত্তরে আমি বলব, কখনোই না।

ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষের নীতি-নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটানো। এই নৈতিকতার গুরুত্ব উপযোগবাদের তত্ত্বকে খারিজ করে দেয়। অন্যদিকে, নব্য পশ্চিমা সভ্যতার অবস্থান ঠিক এর বিপরীত। বস্তুগত উপযোগীতা তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ছড়ি ঘুরাচ্ছে। আর নৈতিকতাকে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে অন্ধকার কুঠুরিতে। পাশাপাশি এর তাত্ত্বিক আলোচনাকেও নিন্দার চোখে দেখা হচ্ছে। অথচ সমাজকে প্রভাবিত করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও এই (তাত্ত্বিক) নৈতিকতার নেই।

এই অবস্থায় নৈতিকতার কথা বলাটাই যেন ভণ্ডামি। আর এজন্যেই মার্জিত

থেকে জন্ম হয় ১৫ টি স্বাধীন রাষ্ট্রের। - (অনুবাদক)

বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী পশ্চিমের আধুনিক চিন্তকরা, পশ্চিমা সমাজের ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে আলোচনা করার সময়, আসমানি নীতিশাস্ত্রের বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যান। তাদের চেয়ে যারা কম জ্ঞান রাখে, নৈতিক মূল্যবোধ জিনিসটা যারা পষ্ট করে বোঝে না, তাদের কাছে এই নীতিশাস্ত্রের ধারণাটুকু অবোধগম্য বিষয় হিসেবে টিকে আছে। এদের অবস্থা যেন ওই গণিতবিদের মতো, যাকে নির্দিষ্ট কিছু অমূলদ সংখ্যা[৪৪] নিয়ে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু সেই সংখ্যাগুলো তার বোধশক্তির ঊর্ধ্বে। ফলে (সমাধান করতে গিয়ে) মস্তিষ্কের গাঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে কল্পনাশক্তির যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা (অতিক্রম করার) জন্যে দরকার একটি সেতুর।

নৈতিকতা নিয়ে এমন ভেলকিবাজি, যে-কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধের জন্যেই বেমানান। আর সে-জন্যেই ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার নৈতিক ভিত্তির কোনো তুলনা চলে না। তার মানে এই না যে, পাশ্চাত্যের কিছু কিছু সঠিক পদক্ষেপ এবং ফলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান দেখে মুসলিমরা উদ্বুদ্ধ হবে না। কিন্তু এই উদ্দেশ্য চুকে গেলে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে সব দফারফা করে ফেলতে হবে। এর চাইতে আগ বাড়িয়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তা-চেতনা, জীবনবোধ এবং সমাজনীতির হুবহু অনুকরণ করতে গেলে, ইসলামি ভাবাদর্শের গায়ে মারাত্মক আঘাত আসবে।

---

[৪৪] দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হিসেবে প্রকাশ করা যায় না, এমন সংখ্যাকে অমূলদ বলা হয়। - (অনুবাদক)
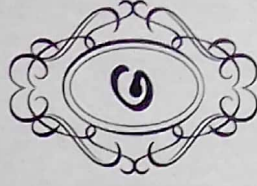
ক্রুসেডের বিভীষিকা

আধ্যাত্মিক দিক থেকে পশ্চিমারা সম্পূর্ণ দূরে সরে গিয়েছে। এটা একটা দিক। এই দিকটা ছাড়াও অন্য আরেকটি কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ থেকে মুসলিমদের বিরত থাকা উচিত। সেটা হলো, পশ্চিমারা তাদের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জিকে ইসলাম-বিদ্বেষের মোড়কে সাজিয়ে নিয়েছে।

ক্ষেত্র-বিশেষে এটা প্রচীন ইউরোপ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার। গ্রিক এবং রোমানরা স্রেফ নিজেদেরকেই 'সভ্য' বিবেচনা করত। আর ভিনদেশীদের, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পূর্বদিকের বাসিন্দাদেরকে[৪৫] বলত 'বর্বর'। মূলত সেই সময় থেকেই অন্য সবার চাইতে পশ্চিমারা নিজেদেরকে 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হিসেবে বিশ্বাস করে আসছে। অ-ইউরোপীয়দের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা পশ্চিমাদের একটি অন্যতম রীতি।

তবে ইসলামের প্রতি তাদের মনোভাব কী, সেটা বোঝার জন্যে কেবল এই দিকটাই যথেষ্ট নয়। ভিনদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতির দিকটা আলোচনা করতে গিয়ে, তারা শুধু ইসলামের ক্ষেত্রেই পুরোপুরি আলাদা একটি অবস্থান নেয়। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সুদূরপ্রসারী এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি বলা যায়। এটা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক কারণেই তৈরি হয়নি। এর সাথে জড়িয়ে আছে এক অতিরঞ্জিত আবেগ। পশ্চিমারা হয়তো বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু দর্শনকে সত্য বলে স্বীকার করে না। কিন্তু এসবের ব্যাপারে তারা সব সময় ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখে। অন্তত এগুলোকে বিচার-বিবেচনাযোগ্য তত্ত্ব বলে

[৪৫] অর্থাৎ প্রাচ্যের অধীবাসীদেরকে। - (অনুবাদক)

তারা তাদের পক্ষে কোনো দলিল সাব্যস্ত করতে পারেন না, সেখানে কাটছাঁট করে সাক্ষীদের অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি টেনে আনেন। কিংবা (ইসলামের প্রতি) বিদ্বেষ থাকার কারণে, সাক্ষীদের তথ্য-প্রমাণকে অপব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের উত্থাপিত দলিলগুলোকে পাঁচ পয়সারও দাম দেন না। ফলে, প্রাচ্যবিদ কিংবা পশ্চিমাদের লেখনীতে আমরা ইসলাম ও মুসলিমদের এক বিকৃত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

বিকৃতির এই ধারা কেবল একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইংল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি এবং হল্যান্ডের মতো দেশগুলোতেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানেই প্রাচ্যবিদরা ইসলাম নিয়ে নাক গলিয়েছে, সেখানেই এই ঘটনা ঘটেছে। তীর্যক মন্তব্য করার জন্যে বাস্তবিক বা কাল্পনিক ছুতা খুঁজে বেড়ানোর খায়েশ, সব সময় তাদের মধ্যে ছিল। এর মাধ্যমে তারা পাশবিক আনন্দ পেত।

প্রাচ্যবিদরা নিজেরা কোনো বিশেষ জাতি নয়। তারা নিজ নিজ সমাজ-সভ্যতার প্রতিনিধি। তাই আমারা এই উপসংহারে আসতে বাধ্য হই যে, বেশকিছু কুধারণা ও একপাক্ষিক চিন্তা-ভাবনার কারণে ধর্মতত্ত্ব এবং সভ্যতা হিসেবে প্রাচ্যবিদরা ইসলামকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।[৪৮] এর একটি কারণ হলো, তাদের পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী গোটা বিশ্বকে 'সভ্য' ও 'বর্বর' এই দুটি ভাগে বিভক্ত করা। আরেকটি কারণ সরাসরি ইসলাম-(বিদ্বেষী মনোভাবের) সাথে জড়িত। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে, বিশেষ করে মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিষয়টা ফুটে ওঠে।

ইউরোপীয় জোট এবং ইসলামি দুনিয়ার সাথে বড় মাপের সংঘর্ষ বাধে

---

[৪৮] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ৫ নং পাদটীকা)** : এই ক্ষেত্রে শেষের অর্ধ-শতকে আমরা ইউরোপ ও আমেরিকান ওরিয়েন্টালিস্টদের লেখার অভিব্যক্তি ও পন্থায় বিশাল উন্নতি লক্ষ করেছি। যদিও তাদের কিছু সংখ্যক এখনো পূর্ববর্তী কুসংস্কার পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। মোটের ওপর, ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের ব্যাপারে ওরিয়েন্টালিস্টদের লেখার মাঝে ধীরে ধীরে ইসলামি চিন্তাধারা ও মুসলিমদের লক্ষ্য নিয়ে প্রশংসা উঠে আসছে। আর গুরুত্বপূর্ণ ওরিয়েন্টালিস্টদের সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের পুরোনো প্রবণতা অনেকাংশেই লোপ পেয়েছে।

ক্রুসেডের[৪৯] সময়। মূলত এর মাধ্যমেই পাশ্চাত্য সভ্যতা (পুরোপুরি ইসলামের) সংস্পর্শে আসে। ওই সময়ে ইউরোপীয় সভ্যতা গির্জার সাথে আটঘাট বেঁধে রেখেছিল। রোমান সভ্যতার পতন-পরবর্তী এই অন্ধকার যুগটাতে[৫০] পশ্চিমারা চোখমেলে দেখতে শুরু করেছিল। তার সাহিত্যকলার ওপর ঝিরিঝিরি করে বইছিল হিমেল হাওয়া। গথ, হান এবং এভারদের[৫১] প্রবল আক্রমণের কারণে স্থবির হয়ে পড়েছিল যে চারুকলা, তার অঙ্কুরোদগম হচ্ছিল ধীরে ধীরে। মধ্যযুগের বর্বরতা কাটিয়ে সে-সময় ইউরোপে শুরু হয়েছিল নবজাগরণ। এর ফলে খুলে গিয়েছিল সংস্কৃতির এক নতুন দিগন্ত। আর এরই হাত ধরে বাড়ছিল অনুধাবনের ক্ষমতা।

ঠিক এ সময়টাতেই ইসলামি বিশ্বের সাথে তার বৈরী যোগাযোগ শুরু হয় ক্রুসেডের হাত ধরে। তবে ক্রুসেড শুরুর আগ থেকেই মুসলিমদের সাথে ইউরোপের সংঘর্ষ দানা বেঁধেছিল। কারণ, আরবরা দখল করে নিয়েছিল সিসিলি এবং স্পেন। অভিযান চালিয়েছিল ফ্রান্সের দক্ষিণভাগে। কিন্তু এ-সবই ছিল খ্রিস্টবাদে দীক্ষিত ইউরোপের সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হবার পূর্বের ঘটনা। তাই ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে তখন দেখা হয়েছে স্থানীয় সমস্যা হিসেবে। ব্যাপারটিকে ওরা তেমন আমলে নেয়নি। একমাত্র ক্রুসেড যুদ্ধই ইসলামের সাথে ইউরোপের এমন (বৈরী) সম্পর্ক তৈরি করে—বহু শতাব্দী ধরে যা চলে আসছে।

ক্রুসেড যেন আবশ্যক বিষয় ছিল। কারণ, সময়টা ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার বাল্যকাল। ওই সময়ে তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেতে শুরু

---

[৪৯] ক্রুসেডের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইতিহাসবিদ ইসমাইল রাইহান বলেছেন, "পরিভাষাগত দিক থেকে ক্রুসেড বলতে সেসব যুদ্ধকেই বোঝানো হয়, যেগুলোর জন্যে খ্রিস্টান ধর্মনেতা ও পাদরিরা জনতাকে আহ্বান করেছেন এবং যা ক্রুশদণ্ডের নামে সংঘঠিত হয়েছে। এই ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয়েছে ৪৮৯ হিজরি থেকে, ৬৯০ হিজরিতে এসে তা সমাপ্ত হয়। যুদ্ধটি প্রায় ২০০ বছর দীর্ঘায়িত ছিল।" [রাইহান, *মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ*, ৯/৮৩-৮৪] – (অনুবাদক)

[৫০] রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে নিয়ে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে 'Dark Age', বা অন্ধকার যুগ বলা হয়। এই সময়টাতেই ইউরোপের চারিদিকে অজ্ঞতার অন্ধকার ভর করে ছিল। [*Oxford advanced learner's dictionaty*, p. ৩৮৬] - (অনুবাদক)

[৫১] এই গোত্রটির উৎস ও ভাষা জানা যায়নি। ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে তারা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে এবং কনস্টান্টিনোপল (আজকের ইস্তাম্বুল) দখল করে ফেলে। - (অনুবাদক)

করেছিল। হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে তার বিকাশ ঘটছিল। শৈশবের দুরন্তপনার ছাপ যেমন চেতন বা অবচেতনভাবে মানুষের পরবর্তী জীবনে দেখতে পাওয়া যায়, জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটা ঘটে। সেসব দুরন্তপনা এমনভাবে গেঁথে যায় যে, পরবর্তী সময়ে তা ছেড়ে দেওয়াটা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতা বাড়লেও, কিংবা আবেগী সময় পাড়ি দিয়ে অভিজ্ঞ হয়ে গেলেও সেগুলো ছাড়া দায়।

ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই ঘটেছে। এগুলো ইউরোপীয়দের মনে বেশ গভীর এবং স্থায়ী রেখাপাত করে। ওই সময় তাদের প্রতিটি স্তরে যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, গোটা ইউরোপ আর কখনোই তা প্রত্যক্ষ করেনি। পরবর্তী সময়ের কোনো কিছুর সাথেই এর তুলনা চলে না। উন্মাদনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে পুরো মহাদেশ জুড়ে। উল্লাসে ফেটে পড়তে থাকে সবাই। কিছু সময়ের জন্যে হলেও জাতি-রাষ্ট্র-গোত্রগুলোর মধ্যে একতা তৈরি হয়। ইতিহাসে প্রথম বারের মতো জোটবদ্ধ হয় ইউরোপ। এই ঐক্য ছিল ইসলামি দুনিয়ার বিরুদ্ধে।

কোনো প্রকার রাখঢাক না করে আমরা বলতে পারি, ক্রুসেডের উন্মাদনা থেকেই জন্ম হয় আধুনিক ইউরোপের। এর পূর্বে তারা প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষা এবং জার্মানি, ফরাশি, নরম্যান[৫২], ইতালিয়ান, ড্যানিশ ইত্যাদি (জাতীয়তাবাদী পরিচয়ে) বিভক্ত ছিল। কিন্তু ক্রুসেডের সময় ইউরোপের জাতি-রাষ্ট্রগুলো 'খ্রিস্টেনডম'[৫৩] নামক নতুন একটি রাজনৈতিক ধারণার জন্ম দেয়। অথচ খ্রিস্টধর্মের সাথে এর কোনো যোগসাজস ছিল না। মূলত এর পেছনে গডফাদার হিসেবে কাজ করেছিল 'ইসলাম-বিদ্বেষ'। এটি ইতিহাসের সম্মিলিত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই চেতনার পেছনে

[৫২] উত্তর ইউরোপের ভাইকিং জাতির লোক। এরা ফ্রান্সের নরম্যান্ডি আক্রমণ করে সেখানে বসতি গড়ে তোলে। ১০৬৬ সালে তারা ইংল্যান্ড আক্রমণ করেছিল। [*Oxford advanced learner's dictionaty*, p. ১০৩৫] - (অনুবাদক)

[৫৩] সকল খ্রিস্টান ও খ্রিস্টান-অধ্যুষিত দেশের সম্মিলন। [*Oxford advanced learner's dictionaty*, p. ২৬১] ক্রুসেডের সময়টাতে খ্রিস্টানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে রাজনীতিবিদরা এই ধারণার জন্ম দেয়। ইউরোপের সকল খ্রিস্টানরা এর ছত্রছায়ায় জোটবদ্ধ হয়। - (অনুবাদক)

অকপটে কলকাঠি নেড়েছে খ্রিস্টান গির্জা।[৫৪] অথচ গির্জার সকল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মাধ্যমেই কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এতখানি উন্নত হতে পেরেছে।

গির্জা এবং ইসলাম—উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই ক্রুসেড ছিল একটি মর্মান্তিক পদক্ষেপ। গির্জার জন্যে মর্মান্তিক এই কারণে যে, চমৎকার একটি যাত্রা শুরু করার পরেও ইউরোপের চিন্তাধারার ওপর সে তার প্রভাব ধরে রাখতে পারেনি। আর ইসলামের জন্যে মর্মান্তিক হবার কারণ হলো, বহু শতাব্দী ধরে ক্রুসেডের আগুন তাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ক্রুশ বহনকারী তথাকথিত ধার্মিক যোদ্ধারা ইসলামের যেসব অঞ্চল দখল করেছিল এবং যেগুলো পরবর্তী সময়ে ছেড়ে দিয়েছিল, সেখানে অকথ্য বর্বরতা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল।[৫৫] এর মাধ্যমেই তারা দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতার বিষাক্ত বীজ বপন করে। যা এখনো পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ককে বিষাদময় করে রেখেছে। এটাই হলো বৈরীতার সুপ্ত কারণ।

---

[৫৪] ফ্রান্সের উন্মাদ পাদরি পিটার একদল সন্ন্যাসীকে সাথে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস সফর করতে যান। সে-সময় আল-কুসদের বিশপ তাকে জানান যে, খ্রিস্টানদের ওপর মুসলিমরা নির্যাতন চালাচ্ছে। এরপর তিনি পিটারকে বলেন, "একমাত্র ইউরোপীয় সম্রাট-ই আমাদেরকে এই অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে পারবেন।" এসব কাল্পনিক অত্যাচারের গালগল্প শুনে পিটার তার এই বক্তব্যে সায় দেন। ইউরোপ ফিরে গিয়ে তিনি দেখা করেন রোমের পোপের সাথে সাথে। ওই সময় রোম ছিল খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার বাসস্থান। পোপ দ্বিতীয় আরবান তাকে স্বাগত জানান। পিটার তার কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। পোপ তাতে সম্মতি দেন।

১০৯৫ সালে ফ্রান্সের ক্লার মাউন্ট নগরীতে পোপের আহ্বানে বিশাল ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভার শেষ অধিবেশনে অনলবর্ষী বক্তৃতা প্রদান করে সভাকে উত্তেজিত করে তুলেন পিটার। তখন পোপ আরবান বলে, "যে ব্যক্তি ক্রুশ উঠিয়ে এই যুদ্ধে সঙ্গী হবে না, সে আমার অনুসারী নয়।" এই কথা শুনে উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মূলত এভাবেই ক্রুসেডের যাত্রা শুরু হয়। এর পেছনে ষোলো আনা কলকাঠি নেড়েছে খ্রিস্টান পোপ ও পাদরিরা। [রাইহান, *মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ*, ৯/৭৮-৮৩] – (অনুবাদক)

[৫৫] অল্প কথায় তাদের ওই লোমহর্ষক বর্বরতার কথা তুলে ধরা দায়। তবে এইটুকু বলে রাখি : বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর তারা কয়েক সপ্তাহ ধরে গণহত্যা চালায়। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-আলিম কাউকেই তারা ছাড় দেয়নি। বাইতুল মুকাদ্দাসের আশেপাশে এমনভাবে রক্তের ধারা প্রবাহিত হয় যে, রক্তের স্রোতের ওপর লাশ সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছিল। নিহতদের রক্তের ঢেউ ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত উঁচু হয়ে গিয়েছিল। [বিস্তারিত : *মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ*, ৯/৮৬-৮৮] – (অনুবাদক)

ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার আধ্যাত্মিক ভিত্তি এবং সামাজিক লক্ষ্য আলাদা। এরপরও একে-অপরকে বরদাস্ত করার সুযোগ ছিল। নিজেদের মাঝে সৌহার্দ্য বজায় রেখে তারা পাশাপাশি অবস্থান করতে পারত। স্রেফ তাত্ত্বিকভাবেই নয়, বাস্তবেও এটা সম্ভব ছিল। মুসলিমদের পক্ষ থেকে আন্তরিকতা এবং সম্মানের নজির সব সময়ই দেখতে পাওয়া যায়। খলিফা হারুনুর রশীদ মূলত এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই সম্রাট শার্লেমনের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন।[৫৬] ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বাস্তবিক অর্থে লাভবান হওয়ার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। কিন্তু সে-সময়টাতে ইউরোপের সংস্কৃতি এতটাই বর্বর ছিল যে, এ ধরনের সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা করেনি। অবশ্য (খলিফার) এই পদক্ষেপকে তারা খারাপ চোখেও দেখেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আচমকা বেজে ওঠে ক্রুসেডের দামামা। ফলে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্ক বানচাল হয়ে যায়।

কোনো গতানুগতিক যুদ্ধের কারণে এমনটা হয়নি। জাতিসমূহের মাঝে তো কত যুদ্ধই হয়ে থাকে। সময় গড়ালে ইতিহাস থেকে সেসব মুছেও যায়। কত শত্রুতাই তো বন্ধুত্বের রূপ ধারণ করে। কিন্তু ক্রুসেডারদের বর্বরতা স্রেফ অস্ত্রের ঝনঝনানিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মোটাদাগে এটা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন। মুসলিম-বিশ্বের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে খেপিয়ে তোলা হয়েছিল গোটা ইউরোপের চিন্তা-চেতনাকে। ইসলামের শিক্ষা ও দর্শনের বিরুদ্ধে আষাঢ়ে গল্প সাজিয়ে, তিলকে তাল বানিয়ে ফেলেছিল গির্জার পাদরিরা। ইসলাম হলো অসভ্য ও বর্বর ধর্ম, আত্মশুদ্ধির তুলনায় লৌকিকতা এখানে বেশি প্রাধান্য পায়—এই ধরনের উদ্ভট চিন্তাধারা ইউরোপের মন-মগজে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। আর বহুকাল ধরে তা বদ্ধমূল থেকে যায়।

ক্রুসেডের উন্মাদনার প্রভাব পড়ে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলগুলোতেও।

---

[৫৬] খলিফা হারুনুর রশীদ ফ্রান্সের রাজা শার্লেমনকে একটি প্রশিক্ষিত হাতি উপহার দিয়েছিলেন। পাশাপাশি দিয়েছিলেন একটি ঘড়ি। এই ঘড়ি দেখে ইউরোপীয়রা খুব বিস্মিত হয়েছিল। তারা ভাবত, এই যন্ত্র বোধহয় জাদুবিদ্যা দিয়ে চলে। শার্লেমনের প্রতি খলিফার বেশ উদারতা দেখান। এমনকি শার্লেমনকে সম্মান করে বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবিও তাকে অর্পণ করেন। [রাইহান, *মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ*, ৭/১৯৫-৯৬] - (অনুবাদক)

'অসভ্য মানুষের জোয়াল'[৫৭] কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলার জন্যে উদ্‌বুদ্ধ হয় স্পেনের খ্রিস্টানরা। মুসলিম (শাসিত) স্পেনে ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকে লম্বা সময় ধরে। দীর্ঘস্থায়ী এই বিবাদের ফলে ইউরোপীয়দের মাঝে ইসলাম-বিদ্বেষ আরও তীব্র হয় এবং প্রকট আকার ধারণ করে। এর ফলে অকথ্য বর্বরতার মাধ্যমে স্পেনের মুসলিম ঐতিহ্যকে উপড়ে ফেলা হয় সুকৌশলে। আর গগন-বিদারী উল্লাসের মাধ্যমে এ বিজয় প্রতিধ্বনিত হয় গোটা ইউরোপ জুড়ে। এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইতি ঘটে গৌরবময় এক সভ্যতার। মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও অসভ্যতা মনে করে একে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। স্পেনে মুসলিম-শাসনের শেষ নিদর্শন হিসেবে টিকে ছিল গ্রানাডা রাজ্য। কিন্তু ১৪৯২ সালে খ্রিস্টানরা তা পুনর্দখল করে।

তৃতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ইসলামের সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হয়। সেটা হলো, তুর্কিদের হাতে কনস্টান্টিনোপল এর পতন।[৫৮] ইউরোপীয়দের চোখে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তখনো প্রাচীন গ্রিক ও রোমানদের ঐতিহ্য ধরে রেখেছিল। এই সাম্রাজ্য ছিল এশিয়ার বর্বরদের হাত থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ! কিন্তু বাইজান্টাইন পতনের ফলে মুসলিমদের জন্যে ইউরোপের দুয়ার খুলে যায়। পরবর্তী যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শতাব্দীগুলোতে এই ধারা অব্যাহত থাকে। ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপের শত্রুতা কেবল সাংস্কৃতিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রাজনৈতিকভাবেও তা গুরুত্ব পায়। আর রাজনৈতিক (পদক্ষেপ, শত্রুতার) আগুনে ঘি ঢালে।

এসব যুদ্ধ থেকে বেশি লাভবান হয় ইউরোপ। রেনেসাঁসের মাধ্যমে ইউরোপে শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ ঘটে। আর (রেনেসাঁসের সব)

[৫৭] 'অসভ্য মানুষের জোয়াল' বলতে এখানে মুসলিম-শাসনের কথা বোঝানো হয়েছে। কারণ, ইউরোপীয়রা মুসলিমদেরকে বলত 'বর্বর'। আর ওই সমটাতে স্পেনের শাসনব্যবস্থা ছিল মুসলিমদের হাতে। ক্রুসেডের মাধ্যমে মুসলিম-শাসন থেকে স্পেনকে মুক্ত করার ব্যাপারে খ্রিস্টানরা অনুপ্রাণিত হয়। (অনুবাদক)

[৫৮] কনস্টান্টিনোপল ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী। মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগ থেকে নিয়ে সুলতান মুহাম্মাদের সময়কাল পর্যন্ত, মোট ১১ বার মুসলিমরা সেখানে অভিযান চালায়। শেষমেশ সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের হাত ধরে ১৪৫৩ সালে মুসলিমরা কনস্টান্টিনোপল জয় করে। এই বিজয়ের কৃতিত্ব-স্বরূপ সুলতান মুহাম্মাদকে 'ফাতিহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। [রাইহান, *মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ*, ১০/৪৬৯] - (অনুবাদক)

উপকরণ ধার করা হয় ইসলামি দুনিয়া থেকে। বিশেষ করে আরবদের কাছ থেকে। অবশ্য এর পেছনে পূর্ব-পশ্চিমের বৈষয়িক সম্পর্ক অনেকাংশে দায়ী। এর ফলে সভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ইসলামি বিশ্বের চেয়ে ইউরোপ একধাপ বেশি অগ্রসর হয়। মুসলিমদের অবদান এই ক্ষেত্রে অনেক। কিন্তু ইসলাম-বিদ্বেষের পূর্ব জের ধরে ইউরোপ কখনোই এটা স্বীকার করতে চায়নি। অন্যদিকে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তাদের ঘৃণা। একসময়ে এটা 'প্রথা' হিসেবে রূপ নেয়। পশ্চিমা জনসাধারণের সামনে 'মুসলিম' শব্দটা উচ্চারণ করলেই (ওদের মনে) কেমন জানি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। সর্বমহলে এটি যেন নীতিবাক্যে পরিণত হয়েছে। এই ঘৃণা খোদাই করে দেওয়া হয়েছে ইউরোপের প্রতিটি নর-নারীর অন্তরে।

সবচেয়ে অবাক-করা বিষয় হলো, এত এত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এই ধারণা আজও টিকে আছে। সংস্কার আন্দোলনের সময় খ্রিস্টান উপদলগুলো দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। কিন্তু ওই মুহূর্তেও ইসলাম-বিদ্বেষ ছিল তাদের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। তারপর এমন এক সময় এল, যখন ইউরোপের ধর্মীয় অনুভূতির অবক্ষয় হতে লাগল। কিন্তু ইসলাম-বিদ্বেষ রয়েই গেল (তাদের অন্তরে)। এর বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক 'ভলতেয়ার' এর মাধ্যমে। ১৮শ শতকের দিকে যিনি ছিলেন গির্জার অন্যতম প্রধান শত্রু। একইসাথে তিনি ছিলেন ইসলাম এবং নবিজির কট্টর দুশমন। কিছু দশক পর এমন এক সময় আসে, যখন পাশ্চাত্যের শিক্ষিত গোষ্ঠী অনান্য সভ্যতা নিয়ে গবেষণা শুরু করে। এগুলোকে তারা দেখতে থাকে সহানুভূতির নজরে। একমাত্র ইসলামের ক্ষেত্রেই তাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে চিরাচরিত বিদ্বেষ এসে জায়গা করে নেয়। এটাকে বলা যায় অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব।

ইউরোপ এবং ইসলামি দুনিয়ার মধ্যে ইতিহাস যে সাংস্কৃতিক ফাটল তৈরি করেছিল, দুর্ভাগ্যবশত তা আজও মেটেনি। ইসলাম-বিদ্বেষ ইউরোপীয় চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা সত্যি যে, আধুনিক জমানার (শুরুর দিকে) প্রাচ্যবিদরা ছিল খ্রিস্টান মিশনারি। এরা মুসলিম দেশগুলোতে কাজ করত। ইসলামি আদর্শ ও ইতিহাসের যে বিকৃত তারা

চিত্র অঙ্কন করেছিল, তা অনেকাংশেই 'বর্বরদের' প্রতি ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। 'প্রাচ্যতত্ত্ব' অনেক আগেই মিশনারিদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তারপরও পশ্চিমাদের চিন্তার বিভ্রাট এখনো কাটেনি। তাই, ধর্মীয় উন্মাদনার কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে—এই ধরনের অজুহাত পেশ করার সুযোগ নেই। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এই একচোখা দৃষ্টিভঙ্গি মূলত পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পাওয়া। ক্রুসেড এবং এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের কারণে ইউরোপীদের মনে যে গভীর প্রভাব পড়েছিল, তার ভিত্তিতেই এই মানসিকতা গড়ে ওঠে।[৫৯]

পশ্চিমাদের ধর্মীয় অনুভূতি তো এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন বলা চলে। তা হলে গির্জার আধ্যাত্মিক প্রভাবের কারণে সৃষ্ট সেই পুরোনো বিদ্বেষ কী করে এখনো স্থায়ী হতে পারে?—হয়তো এই ধরনের প্রশ্ন জাগতে পারে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘটনাটা পরস্পর-বিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু একজন অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর কাছে এটা মোটেই আশ্চর্যজনক কিছু নয়। তিনি জানেন, মন-মগজে গেঁথে দেওয়া ছেলেবেলার ধর্মবিশ্বাসকে একজন ব্যক্তি হয়তো ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু ওই বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত কিছু কুসংস্কার ব্যক্তির অন্তরে বদ্ধমূল থেকেই যায়। আর ওই কুসংস্কার ব্যক্তির যৌক্তিক চিন্তাধারাকে সারাটা জীবন প্রভাবিত করে।

ইসলামের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক এমন। যদিও ইসলাম-বিদ্বেষী মনোভাবের পেছনে যে ধর্মীয় অনুভূতি কলকাঠি নাড়ত, ইতিমধ্যেই সেটা পুরোপুরি বস্তুবাদী রূপ নিয়েছে। তারপরও পশ্চিমাদের মনে অবচেতন-

[৫৯] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ৬ নং পাদটীকা)** : এটা মাথায় রাখতে হবে যে বইটি ১৯৩৩ সালে লেখা হয়েছে, যেমনটা আমি ৫নং টীকায় বলেছি। শেষের দশকগুলোতে ওরিয়েন্টালিস্টদের লেখনীতে কিছু পরিবর্তন এসেছে। তা সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকার 'জনমনের চিন্তাধারা' বলতে যা বোঝায়, তা আজও ইসলাম ও ইসলামি জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই অবস্থার জন্যে মুসলিমরা নিজেরাই দায়ী। একদিকে, তারা পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও সাহিত্য সংঘগুলোকে পুরোপুরি বিবেচনায় এনে, সে অনুযায়ী পাশ্চাত্যের কাছে ধারাবাহিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ইসলামি চিন্তাধারাকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে, মুসলিমরা ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার বস্তুনিষ্ঠ ইনসাফপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় এবং সমাজ-রাজনৈতিক লক্ষ্যকে তুলে ধরার বেলায় যে সঙ্কীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে, তাকে যৌক্তিক বলা যায় না।

তাবেই সেই পুরোনো বিদ্বেষ এখনো রয়ে গিয়েছে। অবশ্য এই বিদ্বেষের মাত্রা একেক-জনের ক্ষেত্রে একেক রকম। কিন্তু এটার অস্তিত্ব বিলীন হয়নি কখনো। ক্রুসেডের প্রেতাত্মা আজও চুপিসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাশ্চিমা জগতে। আর মুসলিম-বিশ্ব এবং ইসলামি অনুশাসনের ব্যাপারে পশ্চিমাদেরকে সে প্রভাবিত করে যাচ্ছে।

"অতীতের ভয়াবহ সংঘাতের কারণে ইসলামের প্রতি পশ্চিমাদের যে বিদ্বেষ তৈরি হয়েছিল, আজ সেটা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে"—এই ধরনের কথা প্রায়ই শোনা যায় মুসলিমদের কাছ থেকে। এমনকি এটাও বলা হয় যে, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা হিসেবে ইসলামকে বেশ গুরুত্বের সাথে দেখছে পশ্চিমারা। আসলে ইউরোপ-আমেরিকানদের ফাঁকা বুলিকে অসংখ্য মুসলিম সত্য বলে বিশ্বাস করে। এই ধারণা হয়তো তাদের জন্যে মানানসই, যারা বিশ্বাস করেন—সকল ধর্মের মধ্যে ইসলামই কেবল মানুষের ফিতরাতগত চাহিদা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো উপলব্ধি করতে পারে। তাই ইসলামই হলো সমাজের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তা ছাড়া আমাদের নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে গিয়েছেন, কিয়ামতের আগে পুরো মানবজাতি ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসবে।[৬০]

কিন্তু খুব শীঘ্রই যে এমনটা ঘটতে পারে, দুর্ভাগ্যবশত তার কোনো নজির আমাদের হাতে নেই। ভবিষ্যতে হয়তো তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসবে। স্রেফ তখনি এটা সম্ভব হবে, যখন পশ্চিমা বিশ্বে একের-পর-এক ভয়াবহ সামাজিক বিপর্যয় ঘটতে শুরু করবে। এর ফলে আপন সভ্যতা নিয়ে তাদের যে অহমিকা ছিল, তা ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। আর পাশ্চাত্যের মনোভাব এমনভাবে পাল্টে যাবে যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের ব্যাখ্যাকে মেনে

[৬০] ঈসা (আলাইহিস সালাম) কিয়ামতের আগে পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন। তখন গোটা বিশ্বে ইসলাম কায়েম হবে। সকল প্রকার হানাহানি বন্ধ হয়ে যাবে। প্রত্যেক বিষধর প্রাণী বিষশূন্য হয়ে যাবে। মেষপালের সাথে নেকড়ে পাশাপাশি অবস্থান করবে, কিন্তু কোনো মেষকে আক্রমণ করবে না। জমিনে অকল্পনীয় বরকত দেখা যাবে। অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, একদল লোকের আহারের জন্যে একটি ডালিমই যথেষ্ট হবে। আল্লাহ তাআলা দুধেও এত বরকত দেবেন যে, একটি উটনীর দুধ বিশাল একটি দলের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে। [ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, ৪০৭৫, ৪০৭৭] - (অনুবাদক)

নিতে সে বাধ্য হবে। হয়তো এভাবেই তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসবে।

পশ্চিমা সভ্যতা আজ বস্তুগত উন্নতির পুজো করছে। স্রেফ আরাম-আয়েশই তাদের জীবন-সংগ্রামের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ধর্মীয় চিন্তাধারাকে প্রকাশ্যে উপহাস করার প্রবণতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশাবাদী মুসলিমরা আমাদেরকে যা গেলাতে চায়, সে হারে (এই ধর্ম-বিদ্বেষী) প্রবণতা মোটেও কমবে বলে মনে হয় না। আজকাল বলা হচ্ছে, প্রকৃতির দৃশ্যমান গঠনপ্রণালীর পেছনে একজন একক স্রষ্টার অস্তিত্বকে আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করতে শুরু করেছে। আর ওইসব আশাবাদী লোকেরা এই ধারণাকে পশ্চিমাদের ধর্মীয় জাগরণ হিসেবে ধরে নিয়েছে। অথচ পশ্চিমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাথে একক স্রষ্টার ধারণা বড্ড বেমানান।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে একক সক্রিয় উদ্দেশ্য আছে—প্রকৃত বিজ্ঞানীরা এই ধারণাকে কখনো অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু চিরকাল ধরে এই প্রশ্ন করা হচ্ছে, এই উদ্দেশ্যের পেছনে কে দায়ী। ধর্মীয় মতবাদগুলো বলে, এর পেছনে এমন এক সত্তা দায়ী, যিনি অসীম জ্ঞান এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি এমন এক সত্তা, যিনি সুনির্ধারিত এক লক্ষ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরিচালনা করছেন। যিনি পরম সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞানী। যিনি কোনো বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এককথায় তিনি হলেন মহান স্রষ্টা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে কোনো প্রকার ইচ্ছা বা আগ্রহ পোষণ করে না। আসলে এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রের মধ্যেই পড়ে না। ওই সত্তার সূক্ষ্মদর্শীতা, অমুখাপেক্ষীতা এবং তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার দিকটাকে বিজ্ঞান খুব কমই খোলাসা করে থাকে। বিজ্ঞানের মনোভাব অনেকটা এরকম—"হ্যাঁ, এমনটা হতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আসলে এটা জানার বৈজ্ঞানিক কোনো উপায় নেই।"

ভবিষ্যতে এই দর্শন হয়তো একধরনের সর্বেশ্বরবাদী[৬১] সংশয়ে রূপ নিতে

[৬১] Pantheism বা সর্বেশ্বরবাদ একটি দার্শনিক মতামত। এই মতের অনুসারীরা বিশ্বাস করে, ঈশ্বর বিশ্বজগতের বাইরের কেউ নন। বিশ্ব বা প্রকৃতিই ঈশ্বর। এত মতবাদ যারা মেনে

পারে। যেখানে আত্মা ও শরীর, উদ্দেশ্য ও অস্তিত্ব, স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে একাকার করে ফেলা হবে। তাই পশ্চিমারা স্রষ্টার ইসলাম-সম্মত ধারণার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে, এই কথা মেনে নেওয়া আমাদের জন্যে কষ্টকর। কারণ, তারা বস্তুবাদকে বিদায় জানাচ্ছে না। বরং এটাকে নিয়ে যাচ্ছে আরও উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে।[৬২] বর্তমান জমানার মতো পশ্চিমারা আর কখনোই ইসলামকে এতটা অবজ্ঞার চোখে দেখেনি। আমাদের দ্বীনের প্রতি তাদের শত্রুতা হয়তো-বা খানিকটা কমেছে। কিন্তু এটা কখনোই ইসলামি ভাবাদর্শের প্রতি তাদের সম্মান-প্রদর্শনের কারণে নয়। বরং ইসলামি বিশ্বের সাংস্কৃতিক দুর্বলতা এবং অনৈক্যের ফসল।

একটা সময় গোটা ইউরোপ ইসলামের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। এই ভীতিই তাকে ইসলামের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক রীতিনীতি-সহ সকল জিনিসের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে বাধ্য করত। কিন্তু এখন তো পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রভাব অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুতরাং পাশ্চাত্যের তীব্র ইসলাম-বিদ্বেষী মনোভাবে ভাটা পড়াটা খুবই মামুলি ব্যাপার। ধরে নিলাম, তারা ইসলাম-বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড নিয়ে মাথা কম ঘামায়। কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা কখনোই উপসংহার টেনে বলতে পারব না—পশ্চিমারা ইসলামের নিকটবর্তী হচ্ছে। এটা তো ইসলামের প্রতি তাদের

চলে, তাদেরকে সর্বেশ্বরবাদী বলা হয়। অবশ্য এদেরকে আমরা প্রকৃতিপূজারিও বলতে পারি। সর্বেশ্বরবাদীরা বিশ্বাস করে, সবকিছুতেই ঈশ্বর আছেন। সবকিছুই ঈশ্বর। ঈশ্বর কোনো অতিপ্রাকৃতিক সত্তা নন। সর্বেশ্বরবাদের এই ব্যাখ্যা বস্তুবাদী। পরবর্তীকালে এর ভাববাদী ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাখ্যায় প্রকৃতিকে ঈশ্বর না-বলে ঈশ্বরকে প্রকৃতি বলা হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির অস্তিত্বের একটা যুক্তি থাকা আবশ্যক মনে করে সর্বেশ্বরবাদের অনুসারী ভাববাদী দার্শনিকগণ বলেছেন, প্রকৃতির কারণ হচ্ছে ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর-যে প্রকৃতির বাইরে থেকে এসে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, এমনটা নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের মধ্যেই প্রকৃতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। [*দর্শনকোষ*, পৃ. ৩০৩] এটাকে নাস্তিকতাবাদের এক নতুন সংস্করণ বলা যায়। – (অনুবাদক)

[৬২] বিজ্ঞানীদের স্রষ্টা-কেন্দ্রিক ধারণার সাথে ইসলামি স্রষ্টার ধারণা কখনোই মানানসই নয়। তাই কোনো কাফির বিজ্ঞানীর মুখে স্রষ্টার কথা শুনলে, খুশিতে লাফ দেওয়ার কোনো কারণ নেই। ওই সব বস্তুবাদী বিজ্ঞানীরা এমন-এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী, যিনি কেবলমাত্র স্রষ্টা। কিন্তু বিশ্বজগতের ওপর তাঁর কোনো কর্তৃত্ব নেই। তিনি বিধানদাতা নন। অথচ ইসলামের বিশ্বাস এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ইসলাম বিশ্বাস করে : স্রষ্টা কেবল সৃষ্টিকর্তা নন, তিনি বিধানদাতাও। আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করছেন, আর সব সৃষ্টির জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন বিধিবিধান। সবাই সেটা মেনে চলতে বাধ্য। - (অনুবাদক)

চলমান অবস্থাকেই নির্দেশ করে।[৬৩]

পাশ্চাত্য সভ্যতা তার এই অদ্ভুত মানসিকতাকে কখনোই পরিবর্তন করেনি। ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে গিয়ে জীবন পরিচালনার রীতি—অতীতের মতোই সে বহাল রেখেছে। একটু আগেই বলেছি, খুব শীঘ্রই যে পশ্চিমাদের এই অবস্থান পাল্টে যাবে, তার নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম সচল থাকা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা পুরোপুরি উপলব্ধি না করেই ইউরোপ-আমেরিকার কিছু অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ—এর পক্ষে দলিল হতে পারে না। আজ সেখানে চলছে বস্তুবাদের জয়জয়কার। তাই এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এখানে-ওখানে কিছু মানুষ নিজেদের আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্যে ধর্মীয় কথা শুনতে আগ্রহ দেখাবে। মনে রাখা দরকার, পশ্চিমা বিশ্বে স্রেফ মুসলিমরাই দাওয়াতি কার্যক্রম চালাচ্ছে না। সেখানে অনেক খ্রিস্টান গ্রুপও রয়েছে, যারা (খ্রিস্টধর্মের) পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মবাদী আন্দোলন[৬৪] সেখানে বেশ শক্তিশালী। সেখানে রয়েছে বৌদ্ধদের মন্দির এবং দাওয়াতি কার্যক্রম। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইউরোপ-আমেরিকার বহু শহরে। তর্কের খাতিরে মুসলিম দাঈদের মতো সেখানকার বৌদ্ধরাও দাবি করতে পারে—ইউরোপ ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের নিকটবর্তী হচ্ছে।

দু-দলের দাবিই হাস্যকর। কিছু মানুষের ইসলাম বা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কখনোই এটা প্রমাণ করে না যে, এই মতবাদের কোনো-একটি পাশ্চাত্যের জীবনধারাকে উল্লেখযোগ্য হারে প্রভাবিত করছে। কেউ হয়তো একটু আগ

---

[৬৩] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ৭ নং পাদটীকা)** : বিপুল পরিমাণ তেল সম্পদের বদৌলতে মুসলিম বিশ্বের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব, ইসলামি বিশ্বের প্রতি পাশ্চাত্যের বিপুল আগ্রহ জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে শিল্পকলা ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে। এটাও-বা কম কিসে! তবে মুসলিম-খ্রিস্টানদের মধ্যে অহরহ সভা, সেমিনার এবং বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও দ্বীন হিসেবে ইসলাম, পাশ্চাত্যের কাছে কম-বেশি অজানাই রয়ে গিয়েছে।

[৬৪] 'Theosophic movement' বা 'ব্রাহ্মবাদ' একটি ধর্মীয় মতবাদ। প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করাটাই এই মতবাদের সারকথা। [*পরিভাষা কোষ*, পৃ. ২৪৯] রাজা রামমোহন রায় এই মতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় তিনি ১৮২৮ সালে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।- (অনুবাদক)

বাড়িয়ে বলতে পারে, এসব ধর্ম প্রচারকারীরা ইউরোপে সামান্য কৌতুহল জাগানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। বহিরাগত ধর্মবিশ্বাস (পশ্চিমের) কল্পনাবিলাসী মানুষদের অন্তরে এক ধরনের মোহ সৃষ্টি করেছে। মূলত এ কারণেই এমনটা ঘটছে। অবশ্যই সেখানে কিছু ব্যতিক্রম মানুষ রয়েছেন। আছেন কিছু ধর্মান্তরিত ব্যক্তি। তারা হয়তো আন্তরিকতার সাথে সত্যকে তালাশ করেন। কিন্তু এই অল্প সংখ্যক মানুষ তো আর গোটা সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টাতে পারবেন না। পশ্চিমের এসব ব্যতিক্রমী লোকদের সংখ্যার সাথে মার্কসবাদ[৬৫] বা এই ধরনের বস্তুবাদী চিন্তাধারা লালনকারী মানুষদের তুলনা করে দেখতে পারি। এর মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতার আসল চরিত্র আরও গভীরভাবে বুঝতে পারব।

ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, একের-পর-এক অবিশ্বাস্য মাত্রার বিশ্বযুদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক সন্ত্রাস[৬৬] হয়তো লোমহর্ষক পন্থায় পশ্চিমা সভ্যতার বস্তুবাদী আহমিকাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।[৬৭] আর তখন

---

[৬৫] কার্ল মার্কস। পুরো নাম Karl Heinrich Marx, তার প্রচারিত দর্শনকে বলা হয় 'মার্কসবাদ'। মার্কস হলেন বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ এবং দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। মার্কস নিজেকে বিপ্লবী আন্দোলনে শরিক করেন। ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে কৃষক ও শ্রমিকদের যে বিপ্লবী উত্থান ঘটে, মার্কস তাতে পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি পরিচিত হন ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সাথে। তারা দুজনে মিলে নতুন এক বিশ্বদর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই 'মার্কসবাদ' হিসেবে পরিচিত। ১৮৪৮ সালে তারা রচনা করেন 'The Communist Manifesto'; এটাকে মার্কসবাদের অন্যতম মৌলিক দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরপর তিনি লিখেন বিখ্যাত বই *Das Capital*, যা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। মার্কসবাদীদের কাছে এটি বাইবেল সমতুল্য। কার্ল মার্কস ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ লন্ডন শহরে মারা যান। [*Encyclopaedia Britanica*, ১৭/৮০৭-৮১১] – (অনুবাদক)

[৬৬] বৈজ্ঞানিক সন্ত্রাস বলতে এখানে, বিজ্ঞানীদের নিত্যনতুন গবেষণার আলোকে তৈরি নানাবিধ মরণাস্ত্রের কথা বোঝানো হয়েছে। এই যেমন করোনাভাইরাসের কথাই ধরুন। বিশ্বের এই প্রাণঘাতী ভাইরাস যে চীনের Wuhan Institute of Virology থেকে ছড়িয়ে গেছে, এই কথা এখন বেশ জোড়ালোভাবে পশ্চিমা মিডিয়ায় শোনা যাচ্ছে। এ ছাড়া জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, এই বৈজ্ঞানিক সন্ত্রাসবাদকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। - (অনুবাদক)

[৬৭] ১৮১৫ থেকে ব্রিটিশরা বেশ দাপটের সাথে বিশ্বে রাজ করেছে। ওরা বলত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায় না। কিন্তু ১৯১৪ সালের পর আস্তে আস্তে কমতে থাকে তাদের তেজ। আজ সেই অহমিকা ধুলোয় মিশে গেছে। ইতিহাসে প্রায় ৬৯টি সাম্রাজ্যের কথা শোনা যায়। এগুলোর যখন পতন হচ্ছিল, তখন কোনো সুযোগ্য নেতা ছিল না। রোমানদের পতন

আন্তরিকভাবে এবং উদারতার সাথে পশ্চিমারা আবারও বেরিয়ে পড়বে সত্যের খোঁজে। স্রেফ তখনি পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের প্রসার বেগবান হবে। কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তন বহুত দূর কি বাত। সুতরাং, ইসলামি প্রভাব পশ্চিমাদের চিন্তাধারাকে বশীভূত করে ফেলছে, এমনতরো দাবি মুসলিমদের জন্যে বেশ খতরনাক ও আত্মপ্রবঞ্চণা-দায়ক আশাবাদ। এই ধরনের কথাবার্তা আসলে যুক্তিবাদের মোড়কে ঢাকা প্রাচীন মাহদীবাদের ওপর বিশ্বাস ছাড়া কিছুই না। (দ্বীনকে বিজয়ী করার কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে শুধু) এমন এক শক্তির ওপর আস্থা রাখা—যা হঠাৎ করেই প্রকাশিত হবে, আর মুসলিমদের ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থাকে জমিনের ওপর বিজয়ী করবে।[৬৮]

হয়েছে ক্যালিগুলা অথবা নিরোর মতো বিকৃত-মস্তিষ্কের সম্রাটদের হাত ধরে। আমেরিকাতেও আজ গলাবাজ কিংবা বিকৃত চরিত্রের লোকদের হাত ধরে চলছে শাসনক্ষমতা। ইতিহাসের সেরা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তাদের সময়গুলো অতিবাহিত হচ্ছে। শুধুমাত্র আফগান যুদ্ধেই তারা ব্যয় করেছে প্রায় আড়াই ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু ২০ বছর পর নাকানিচুবানি খেয়ে বিদায় নিতে হয়েছে। পতনের বান ঢুকে পড়েছে ওদের সেনাবাহিনীতেও। একে একে লম্বা হচ্ছে তাদের ব্যর্থতার ফিরিস্তি। হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা তাদের পতন দেখতে পাব, ইন-শা-আল্লাহ। - (অনুবাদক)

[৬৮] মাহদীবাদ মূলত এমন এক বিশ্বাস, যেখানে ইসলামকে বিজয়ী করার কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে কেবল মাহদীর অপেক্ষায় বসে বসে দিন গুনা হয়। শিয়াদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল। ইমাম মাহদী (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান খুব পষ্ট। আমরা স্বীকার করি, কিয়ামতের আগে তিনি দুনিয়ায় আসবেন। তিনি এলে আমরা তাঁর দলে যোগ দেব। কিন্তু তাঁর অপেক্ষায় অলস বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। তিনি আসার আগে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসন থেকে ইসলামি সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে।

বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয় শাইখ মুহাম্মাদ আল-আরিফির জবানে। তিনি বলেন, "ফিতনা-ফ্যাসাদ, অশ্লীলতা, অতিশয় সংঘাত এবং কল্যাণের দাওয়াত হ্রাস পাওয়ার ফলে অধিকাংশ মুসলিমদের অন্তরে আজ নৈরাশ্যতার কালো ছায়া ভর করেছে। অনেকেই ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় প্রহর গুনতে শুরু করেছেন। কেউ দাওয়াত ও জিহাদ ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ত্যাগ করেছেন। কেউ দ্বীনি ইলম অন্বেষণ ও প্রচার-প্রসার ছেড়ে ঘরের কোনায় আশ্রয় নিয়েছেন। মনে মনে ভাবছেন যে, সময় কাছে চলে এসেছে। অল্প দিনের ভেতরেই ইমাম মাহদী প্রকাশ পাবে। 'মাহদীর আত্মপ্রকাশ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি', 'ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয়'... ইত্যাদি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এই ভবিষ্যদ্বাণী মুমিনদের জন্যে সুসংবাদ এবং মনোবল বৃদ্ধির সহায়ক। এর বেশি কিছু নয়। সব সময় আমাদেরকে শারীয়ার অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের সাহায্যে

এই ধরনের মতিগতি বেশ খতরনাক। কেননা এটা খুবই আরামদায়ক ও সহজসাধ্য কাজ। এসব ধ্যানধারণা আমাদেরকে এই সত্যিটা উপলব্ধি করতে দিচ্ছে না যে, সংস্কৃতিগত দিক থেকে আমরা কোথাও (বিজয়ী অবস্থায়) নেই। অপরদিকে পশ্চিমা (সংস্কৃতি) আগের চেয়ে আরও প্রবলভাবে মুসলিম দুনিয়ার ওপর তার আগ্রাসী প্রভাব বজায় রেখেছে। এই প্রভাব গোটা ইসলামি সমাজের ভিতকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে এবং ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা স্রেফ পড়ে–পড়ে ঘুমাচ্ছি। ইসলামের বিজয় নিয়ে স্বপ্ন দেখা এক জিনিস, আর এর জন্যে (কোনো প্রকার পক্ষেপ না নিয়ে) আকাশ–কুসুম কল্পনা করা আরেক জিনিস।

এগিয়ে আসতে হবে। মুসলমানদের ভূমিগুলো শত্রুমুক্ত করতে হবে। জিহাদের বিধান পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঐশী সাহায্যের আশায় চাতক পাখি হয়ে বসে থাকলে চলবে না। ইহুদিদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করতে সকল মুসলমানকে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম ভূখণ্ড থেকে দখলদার খ্রিস্টান বাহিনীর বিতাড়ণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় লাঞ্ছিত-অপমানিত অবস্থায় বসে না থেকে, ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে ইসলামের মদদে জান-মাল ব্যয় করতে হবে। অতঃপর যে-কোনো মুহূর্তে মাহদী প্রকাশ হলে আমরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাব।" [আরিফি, *মহাপ্রলয়,* পৃষ্ঠা : ১৭৬] - (অনুবাদক)
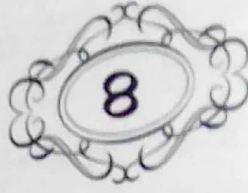
ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা

যেদিন থেকে মুসলিমরা নিজেদের স্থবির সমাজব্যবস্থার পুনর্জাগরণের জন্যে পশ্চিমাদের অনুকরণকে একমাত্র উপায় হিসেবে ভেবে নিয়েছে, সেদিন থেকেই তারা আত্মমর্যাদা খুইয়ে ফেলেছে। আর 'ইসলাম একটি মৃতপ্রায় শক্তি'—পাশ্চাত্যের এই দাবিকেও পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছে।

ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা পুরোপুরি ভিন্ন দুটি জীবনবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মূলনীতির দিক থেকেও একটি অপরটির জন্যে মানানসই নয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই মতের পক্ষে আমি যুক্তি দেখিয়েছি। পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা ওদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক দর্শন ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তখন আমরা কী করে এটা আশা করতে পারি : পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম যুবকরা ইসলাম-বিদ্বেষী মনোভাব থেকে বেঁচে থাকতে পারবে?

এর পক্ষে কোনো যুক্তি দেখানোর সুযোগ নেই। হয়তো তুখোড় মেধাবী কিছু যুবক ওদের সাথে টেক্কা দিয়ে চলতে পারবে। তবে এটা খুবই বিরল ঘটনা। পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা নবিজির বার্তার প্রতি মুসলিম যুবকদের আস্থাকে তিলে-তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ধর্মীয় চেতনায় বলীয়ান ইসলামি সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে তৈরি হওয়ার আকঙ্ক্ষাকে নষ্ট করে ফেলছে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা পশ্চিমা মূল্যবোধকে আপন করে নিয়েছেন, ইসলামি বিশ্বাস থেকে তারা অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছেন।[৬৯] এ ব্যাপারে কোনো

[৬৯] পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী অনেক মুসলিম বিদ্বানদের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায়। এরা একদিকে নিজেকে মুসলিম হিসেবে জাহির করে, অপরদিকে পশ্চিমা সভ্যতার পুজো করে। একদিকে ইসলামি মূল্যবোধের ওয়াজ করে, ওপরদিকে সমকামিতার পক্ষে অবস্থান নেয়।

সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য আমরা এটা বোঝাচ্ছি না যে, ইসলাম স্রেফ অশিক্ষিত লোকদের বাস্তব জীবনেই নির্ভেজাল অবস্থায় টিকে আছে। কিন্তু একটা কথা মানতেই হয়—ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে, পাশ্চাত্য-ঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের চাইতে এদেরকেই আমরা বেশি তৎপর দেখি। হতে পারে তাদের বুঝ কিছুটা ভাসাভাসা। শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বীন-বিমুখ হওয়ার কারণ এটা নয় যে : পশ্চিমাদের যে বিজ্ঞান চর্চা করতে করতে তারা বেড়ে উঠেছেন, সেটা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো যৌক্তিক প্রমাণ হাজির করতে পেরেছে। আসলে পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎটাই ধর্ম-বিদ্বেষী। এটা মুসলিম প্রজন্মের ধর্মীয় প্রতিভার ওপর ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে (একে পিষ্ট করে ফেলেছে)।

স্রেফ যুক্তিতর্কের ওপর নির্ভর করে ধর্মকে বিশ্বাস-অবিশ্বাস করাটা খুবই বিরল ঘটনা। আমরা বলে পারি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান অথবা ধীশক্তির কারণে কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ তার সাংস্কৃতিক বলয়ের মাধ্যমে এই বুঝ অর্জন করে। একটি বাচ্চার কথা চিন্তা করুন। বাল্যকাল থেকেই যাকে বাদ্যযন্ত্রের জমকালো সুরের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে 'সুর-তাল-লয়' শুনে ওর কান অভ্যস্ত। পরবর্তী সময়ে যদি-সে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে কিংবা গান গাইতে নাও পারে, অন্তত কঠিন গানগুলো সহজেই বুঝতে পারবে। কিন্তু যে বাচ্চাটি ছোটকাল থেকেই গান বলতে কিছু শোনেনি, তার জন্যে গানের মর্ম উপলব্ধি করা তো দূরের কথা, সুর বোঝাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তেমন। তবে এমনও কিছু মানুষ আছে, জন্ম থেকেই যাদের কান নেই। ফলে তারা গান শুনতে পায় না। তাই এমনটাও হতে পারে যে, ধর্মের বাণী শোনার ক্ষেত্রেও কিছু লোক নিজেকে পুরোপুরি বধির বানিয়ে রেখেছে।[৭০] কিন্তু বেশিরভাগ জনতার ধর্মের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস

একদিকে মানুষকে সালাতের দাওয়াত দেয়, অপরদিকে হুদুদ-কিসাস-হিজাব ইত্যাদিকে সেকেলে বিধান মনে করে। তারা চায়, যেন আল্লাহও খুশি থাকে, আর শয়তানও নারাজ না হয়। - (অনুবাদক)

[৭০] এদের ব্যাপারেই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "তারা বধির, মূক, অন্ধ। কাজেই তারা (হিদায়াতের দিকে) ফিরে আসবে না।" [সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮] – (অনুবাদক)

করার বিষয়টি নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর। যেমনটা নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

> "প্রতিটি নবজাতকই (ইসলামি) ফিতরাতের[৭১] ওপর জন্মলাভ করে। এরপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারি হিসেবে গড়ে তোলে।" [সহীহ বুখারি, ১/১২৭৫]

বক্তব্যের সারকথা অনুযায়ী, হাদীসে বর্ণিত 'বাবা-মা' শব্দ দুটোকে একটু বিস্তর পরিসরে ব্যবহার করা যায়। যেমন : পারিবারিক জীবন, স্কুল, সমাজ ইত্যাদি—যেসব মাধ্যম দিয়ে শিশুর প্রাথমিক বিকাশ ঘটে আরকি। এটা অস্বীকার করার জো নেই, (নৈতিক) অবক্ষয়ের এই যুগে অনেক মুসলিম পরিবারেই দ্বীনচর্চার অবস্থা খুব বেগতিক। আর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও তাদের অধঃপতন ঘটেছে। তাই উঠতি-বয়সীদের দ্বীন-বিমুখতার প্রথম উদ্দীপক হিসেবে কাজ করছে তার পরিবার। সর্বদা এটা নাও হতে পারে। কিন্তু মুসলিম সন্তানদের পশ্চিমা ভাবধারায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে, ভবিষৎ জীবনে তার মধ্যে অবশ্যই ধর্ম-বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ পাবে।

এখন আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় : আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলিমদের আপত্তি জানানোর দ্বারা আদৌ এটা বোঝায় না, ইসলাম এই ধরনের (জাগতিক) শিক্ষার বিরোধী। এর পক্ষে ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই। পুরো কুরআন জুড়ে আছে জ্ঞানার্জনের উপদেশ। (কুরআনের নানান জায়গায় বলা হয়েছে)—"যাতে

---

[৭১] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ৮ নং পাদটীকা)** : এখানে 'ফিতরাত' শব্দটির মাধ্যমে 'জন্মগত বিশুদ্ধতাকে' বোঝানো হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে সংবেদশীল যে-কোনো প্রাণীর 'আদি স্বভাব-প্রকৃতিকে' নির্দেশ করে। বিশদভাবে বলতে গেলে, জন্ম থেকেই প্রত্যেক মানুষকে সহজাতভাবে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও এককত্ব বোঝার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে হয়েছে, এখানে তার কথা বলা হয়েছে। (লিসানুল আরব, তাজুল আরুস ইত্যাদি; আরও বিস্তারিত : সূরা আর-রুম, ৩০ : ৩০ এবং *দ্য ম্যাসেজ অব দ্য কুরআন*-এর ৬২১ পৃষ্ঠার পাদটীকা-২৭, সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৭২ এবং ২৩০ পৃষ্ঠার ১৩৯ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। এজন্যেই, ইসলামকে বারংবার 'দ্বীনুল ফিতরাহ' বলা হয়েছে। এটা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই দ্বীন মানুষের মনের সহজাত ও আদি প্রকৃতির (সকল প্রশ্নের) পরিপূর্ণ উত্তর দিয়ে থাকে।

করে তোমরা জ্ঞানবান হতে পারো”, “যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো”, “যাতে করে তোমরা জানতে পারো” ইত্যাদি। এই মহিমান্বিত কিতাবের শুরুর দিকে বলা হয়েছে :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

“আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন।” [সূরা বাকারাহ, ২ : ৩১]

এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মানুষকে ওইসব নাম শেখানোর কারণে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ ফেরেশতাদের চাইতেও মর্যাদাবান।[৭২] এখানে ‘নাম’ দ্বারা বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ও অস্থিমজ্জাগত চিন্তাশক্তিকে রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে। চিন্তাশক্তি হলো মানুষের অনন্য ক্ষমতা। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ আল্লাহ তাআলার খলিফা হতে পেরেছে। এটাই কুরআনের বর্ণনা। আর এই চিন্তাশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্যে মানুষের ওপর জ্ঞানার্জনকে আবশ্যক করা হয়েছে। সেজন্যে নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : “ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্যে ফরজ।” [ইবনু মাজাহ, ২২৪]

তিনি আরও বলেছেন : “যদি কেউ ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়, মহান আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন।” [সহীহ মুসলিম, ২৬৯৯]

---

[৭২] আল্লাহ তাআলা বলেন : “আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন। তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন। এরপর বললেন, ‘তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ তারা বলল, ‘আপনি পরম পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।’ তিনি বললেন, ‘হে আদম, তুমি তাদেরকে এই জিনিসগুলোর নাম জানিয়ে দাও।’ অতঃপর যখন সে এগুলোর নাম তাদেরকে জানাল, তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে বলিনি—নিশ্চয় আমি আসমান ও জমিনের গায়েব সম্পর্কে জানি, এবং তাও জানি যা তোমরা প্রকাশ করো ও যা গোপন করো?’ আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, ‘তোমরা আদমকে সিজদা করো।’ তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল এবং অহংকার করল। কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।” [সূরা বাকারাহ, ২ : ৩১-৩৪] – (অনুবাদক)

অন্যত্র তিনি আরও বলেন : "একজন আবিদের ওপর একজন আলিমের মর্যাদা এমন, পূর্ণিমারাতে চাঁদের উজ্জ্বলতা সব তারকারাজির ওপর যেমন।" [মুসনাদে আহমদ, ২১২০৮; তিরমিযি, ২৬৮২; আবু দাউদ, ৩৬৪১; ইবনু মাজাহ, ২২৩; সুনান আদ-দারিমি, ৩৫৪]

জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, তার জন্যে কুরআনের আয়াত এবং নবিজির হাদীস টেনে আনার দরকার নেই। কোনো-প্রকার সংকোচ ছাড়াই ইতিহাস এটা সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামের মতো অন্য কোনো ধর্মই বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ব্যাপারে এতটা উৎসাহ দেয়নি। জ্ঞানার্জন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলাম-যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তার গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন আমরা পাই উমাইয়্যা ও আব্বাসী খিলাফতের আমলে। এবং স্পেন ও সিসিলিতে আরবদের শাসন চলাকালে। আমি এগুলো বড়াই করার জন্যে বলছি না। ইসলামি বিশ্ব আজ তার ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছে। রুহানি দিক থেকে হারিয়ে গিয়েছে অন্ধকারে। ডুবে আছে বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতায়। অধঃপনের এই যুগে গৌরবময় অতীত নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলা আমাদের সাজে না। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ইসলামি অনুশাসন এর জন্যে এক চুলও দায়ী নয়। এটা মুসলিমদের গাফিলতির ফসল।

জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং উন্নয়নের পথে ইসলাম কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে এতটাই মর্যাদা দিয়েছে যে, (এই জ্ঞানের কারণে) মানুষ ফেরেশতাদের চাইতেও উঁচু মাকাম পেয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো ধর্মই জ্ঞানচর্চার প্রতি এতটা গুরুত্ব দেয়নি। আমরা যদি এই দ্বীনের মূলনীতি মেনে চলি, তবে কখনোই আধুনিক শিক্ষাকে আমাদের জীবন থেকে বাদ দেওয়ার কথা কল্পনা করতে পারব না। পশ্চিমা দেশগুলোর মতো বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে, আমাদের মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানচর্চা এবং উন্নতির ইচ্ছে থাকতে হবে।[৭৩] তবে, পশ্চিমাদের চশমা দিয়ে দেখা ও

[৭৩] জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করা ইসলাম-বিরোধী কোনো কাজ নয়। বরং আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা, চিন্তা-ফিকির করা এবং এসবের মাধ্যমে স্রষ্টার মহিমা ফুটিয়ে তোলাটা আমাদের জন্যে ইবাদত। কুরআনে এই ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় আসমান-সমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে বিবেকবানদের জন্যে বহুতর নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা আলি ইমরান, ০৩ : ১৯০] প্রকৃত বিজ্ঞানের সাথে

পশ্চিমা ভাবধারার আলোকে চিন্তা করার আগ্রহ মুসলিমদের মধ্যে বিলকুল থাকা যাবে না। ঈমান টিকিয়ে রাখতে চাইলে, ইসলামের আখিরাতমুখী সভ্যতাকে বস্তুবাদী, পুঁজিবাদী কিংবা মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা দিয়ে বদলানো যাবে না।

জ্ঞান পূর্ব-পশ্চিমের ব্যক্তিগত (সম্পত্তি) নয়। এটা প্রকৃতির মতো সার্বজনীন। একটি বিষয়কে কিভাবে দেখা হবে এবং কিভাবে উপস্থাপন করা হবে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে জাতির কৃষ্টি-কালচারের ওপর। জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান কিংবা উদ্ভিদবিজ্ঞান লক্ষ্যের দিক থেকে না-বস্তুবাদী আর না-আখিরাতমুখী। এসবের মূল কাজ হলো বিষয়-বস্তুকে পর্যবেক্ষণ এবং সংকলন করা। এর মাধ্যমে নিয়মকানুন বের করে আনা। এসব বিদ্যা থেকে যে-দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়, তাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক দর্শন। এসব দর্শনের প্রস্তাবনা স্রেফ তত্ত্ব এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দেওয়া হয় না। জীবন এবং জীবন-সমস্যার ব্যাপারে পূর্ব-নির্ধারিত মানসিকতা এবং সহজাত প্রবৃত্তি এসব সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট বলেছিলেন : "এটা আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের চিন্তাশক্তি প্রকৃতি থেকে উপসংহার টানে না, বরং উপসংহার ঠিক করে দেয়।"

সংক্ষেপে বলা যায়, এসব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিই হলো মুখ্য বিষয়। বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে, এটাই আমাদের চিন্তাশক্তিকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞান আমাদেরকে মহাবিশ্বের ভুলভাল ব্যাখ্যা দিতে প্ররোচিত করতে পারে না। বিজ্ঞান আসলে বস্তুবাদী কিংবা পরকালমুখী

ইসলামের আসলে কোনো বিরোধ নেই। বিরোধটা হলো ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে পশ্চিমারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। তারা তাদের জ্ঞানলব্ধ বাস্তবতাকে ওই বিশেষ মানসিকতার ছাচে ফেলে সে অনুযায়ী বর্ণনা করে থাকে। এরপর সেগুলো বিন্যস্ত করে একটি আদর্শিক নীতিমালা দাঁড় করায়। মূলত তাদের এই আদর্শিক নীতিমালার সাথেই ইসলামের বিরোধ। তাই গবেষণাধর্মী আধুনিক বিজ্ঞান চর্চাটা দোষের কিছু না। বরং এটা জরুরি জিনিস। কিন্তু পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জ্ঞান-গবেষণা চালানো, এবং সে অনুযায়ী বিজ্ঞানের নীতিমালা দাঁড় করানোটা বেশ খতরনাক। পশ্চিমাদের সাথে ইসলামি চিন্তাধারার বিস্তর ফারাক। তাই তাদের দর্শন অনুযায়ী চিন্তা করা ও ফিরিঙ্গিপনা লালন করাটা গোমরাহির কারণ। যাচাই-বাছাই ছাড়াই পশ্চিমাদের তৈরি মানদণ্ডকে মেনে নেওয়া যাবে না। এতে করে আমাদের ঈমানের ওপর আঘাত আসবে। ইসলামি সভ্যতার মূল চেতনাই নষ্ট হয়ে যাবে। - (অনুবাদক)

কোনো বিষয় নয়। মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা আখিরাতমুখী হবে নাকি দুনিয়ামুখী, সেটা নির্ভর করে আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। পাশ্চাত্যের উঁচু তবকার পরিশীলিত বুদ্ধিবৃত্তি অনেক আগ থেকেই বস্তুবাদ দ্বারা প্রভাবিত। তাই এর মৌলিক চিন্তাধারা ষোলো আনাই ধর্ম-বিদ্বেষী। ওদের শিক্ষাব্যবস্থাও যে পুরোপুরি ধর্ম-বিদ্বেষী ধারার হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। অপরদিকে, গবেষণাধর্মী আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা, ইসলামের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের জন্যে দূষণীয় নয়। বরং বিজ্ঞানের নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে মুসলিমরা পশ্চিমা সভ্যতার যে-প্রাণশক্তিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, সেটা বিপজ্জনক।

দুঃখের বিষয় হলো, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বহুকাল ধরে আমরা দূরে অবস্থান করছি। আমাদের উদাসীনতা ও গাফিলতি—আমাদেরকে পুরোপুরি পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জ্ঞান অর্জন করার ওপর ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামের এই মূলনীতি অনুসরণ করলে, আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমাদেরকে পাশ্চাত্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো না। মরুভূমিতে তৃষ্ণায় ছটফট করা ব্যক্তি পানির জন্যে যেমন মরীচিকার পানে তাকিয়ে থাকে, (আমরাও ঠিক তেমন করে ইউরোপের দিকে তাকিয়ে আছি)। মুসলিমরা দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের সম্ভাবনাকে হেলায়-ফেলায় নষ্ট করেছে। ফলে আজ তারা দরিদ্রতা ও অজ্ঞতার কষাঘাতে পিষ্ট। অপরদিকে ইউরোপ খুব দ্রুত গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এই শূন্যতা পূরণ হতে অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণ পর্যন্ত নেহায়েত বাধ্য হয়েই পশ্চিমাদের শিক্ষা-বিষয়ক উপকরণ ব্যবহার করে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে। এর জন্যে অবশ্য কৃতজ্ঞও থাকতে হবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না—আমরা কেবল ওদের বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু এবং কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকব। এর বেশি আগাতে যাব না। অন্যভাবে বলতে গেলে, পশ্চিমাদের তরতিব অনুযায়ী প্রকৃত বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। এক্ষেত্রে যুবকদের গড়িমসি করাটা উচিত হবে না। কিন্তু মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থায় কখনোই তাদের 'দর্শনকে' ঠাঁই দেওয়া যাবে না।

কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন : আজ তো প্রকৃত বিজ্ঞানের অনেক

বিষয়ই গবেষণার পথ পাড়ি দিয়ে চলে গিয়েছে দার্শনিক পর্যায়ে। এই যেমন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর কথাই ধরুন। আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গবেষণামূলক বিজ্ঞান এবং কল্পনাবিলাসী দর্শন আলাদা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। (এই অবস্থায় আমরা কী করব?)

হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যদিক থেকেও চিন্তা করা যায়। ঠিক এইখানে এসেই ইসলামি সংস্কৃতি নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবেন, তখন পাশ্চাত্যের দার্শনিক তত্ত্বগুলোকে ঠেলে দেবেন একপাশে। নিজেদের চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়ে তা বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। এটা তাদের দায়িত্ব। 'ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির' বদৌলতে হয়তো তারা কোনো উপসংহারে পৌঁছতে পারবেন। হতে পারে সেটা পাশ্চাত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের চাইতে ভিন্ন কিছু।

ভবিষ্যতে যা হয় হোক। পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মাথা বন্ধক না রেখে, বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষাদান জারি রাখা সম্ভব। ইসলামি দুনিয়ার জন্যে নিত্যনতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির জরুরত নেই। প্রয়োজন শুধু অত্যাধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির শিক্ষা এবং রুহানি উপকরণের।

ইসলামকে শতভাগ গুরুত্ব দেয়, এমন একটি আদর্শ শিক্ষাবোর্ডকে সিলেবাস প্রস্তাব করতে গিয়ে আমি বলব : পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের মধ্য থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর গণিত যেন মুসলিমদের স্কুলগুলোতে শেখানো হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বেলায় উল্লিখিত আপত্তিও আমলে রাখতে বলব। আর বর্তমান কারিক্যুলামে ইউরোপের দর্শন, সাহিত্য এবং ইতিহাস-চর্চার যে প্রাধান্য রয়েছে, সেটা বাদ দিতে হবে।

ইউরোপীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, সেটা আগেই খোলসা করেছি। তবে ইউরোপীয় সাহিত্যের ব্যাপারে আমাদের অত বেশি উৎসুক হলে চলবে না। এটাকে দেখতে হবে নিতান্তই ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আজকাল মুসলিম দেশগুলোতে যেভাবে এসব পড়ানো হয়, সেটাকে একপাক্ষিক শিক্ষা বলা চলে। পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ

যুবক-যুবতী ও অপরিপক্ক মন-মগজ, ও ধ্যানধারণার অতিরঞ্জনের ফলে যুবক-যুবতী ও অপরিপক্ক মন-মগজ, পশ্চিমা সভ্যতার সঞ্জীবনী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তারা খুব কমই এর নেতিবাচক দিকগুলো উপলব্ধি করতে পারে। এর ফলে শুধু-যে পশ্চিমা মূল্যবোধকে অন্ধভাবে পূজা করার মানসিকতা তৈরি হয়, তা না। ওসব মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের অনুকরণ করা হয়। এটা কখনোই ইসলামি মূল্যবোধের সাথে মানানসই হতে পারে না। তাই মুসলিম স্কুলগুলোতে প্রভাব বিস্তারকারী ইউরোপীয় সাহিত্যকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে। সেখানে নিয়ে আসতে হবে ইসলামি সাহিত্য। যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সংস্কৃতির গভীরতা ও প্রাচুর্য দেখে উজ্জীবিত হয়। এই চিন্তা-চেতনা প্রবেশ করাতে পারলে, ইসলামি সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে।

মুসলিমদের অনেক প্রতিষ্ঠানেই আজ ইউরোপীয় সাহিত্য দাদাগিরি করে বেড়াচ্ছে। এর ফলে মুসলিম তরুণরা ইসলাম-বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর ইতিহাসকে ব্যাখা করার ব্যাপারটিও সমানতালে দায়ী—এটাও মনে রাখতে হবে। তাদের লেখনীতে 'রোমান বনাম বর্বর' দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। এই পৃথিবীতে যা কিছু ছিল এবং যা কিছু সামনে আসবে, সকল কিছুর চাইতে পশ্চিমা জাতি এবং সভ্যতা শ্রেষ্ঠ—এটা প্রমাণ করার লক্ষ্য নিয়েই তারা ইতিহাস বয়ান করে থাকে। অবশ্য তারা তাদের এই ধরনের মতিগতি স্বীকার করতে চায় না। ইতিহাসকে এভাবে পেশ করার মাধ্যমে, গোটা বিশ্বের ওপর পশ্চিমাদের শাসন চালানোকে একপ্রকার নৈতিক বৈধতা দেওয়া হয়।

ইউরোপের দেশগুলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার বিবাদকে নিজেদের আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত। রোমানদের সময় থেকেই এটা চলে আসছে। মানবজাতি কতখানি অগ্রসর হয়েছে, সেটা বিচার করতে হবে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির আদলে। তারা তাদের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চায়। এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি (ইতিহাসের) একটি বিকৃত রূপ তুলে ধরে। ইউরোপীয় আদর্শকে দূরে রেখে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, ঐতিহাসিক সমস্যাগুলোর যে বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে, তা হজম

করাটা পশ্চিমাদের জন্যে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্যের এই অহংকারী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, আজ অবধি তাদের বর্ণিত পৃথিবীর ইতিহাস আসলে ইউরোপের অতিরঞ্জিত ইতিহাস ছাড়া কিছুই নয়। পাশ্চাত্যের বাইরের দেশগুলোর জীবনযাত্রা ও ক্রমবিকাশ ইউরোপ-আমেরিকাকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। স্রেফ এ জন্যেই তাদেরকে আলোচনায় আনা হয়। আপনি যদি পশ্চিমাদের ইতিহাসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করেন, আর পৃথিবীর বাদবাকি অংশকে কেবল একপলক দেখিয়ে যান, তবে তো পাঠক বিভ্রান্ত হবেই। সে ভাববে, পশ্চিমাদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন গোটা দুনিয়ার চাইতে সমৃদ্ধ। পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্যেই বোধহয় পৃথিবীটার জন্ম হয়েছে। বাদবাকি সকল সভ্যতাকে থরেথরে সাজানো হয়েছে পশ্চিমাদের গুণগান করার জন্যে।

ইতিহাসকে এই আঙ্গিকে উপস্থাপন করার ফলে, অ-ইউরোপীয় যুবকরা নিজেদের সংস্কৃতি, পূর্ববর্তীদের ইতিহাস এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। সুকৌশলে তাদেরকে এটাই শেখানো হয়েছে যে, পশ্চিমা আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আঁধারে মিলিয়ে যাবে।

এসব নেতিবাচক প্রভাব দূর করতে চাই পাল্টা পদক্ষেপ। প্রভাবশালী ইসলামি বুদ্ধিজীবীদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। মুসলিমদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতিহাসের সিলেবাস সংশোধন করার উদ্যোগ নিতে হবে। এটা যে গুরুদায়িত্ব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা ইতিহাসের ধারাকে ঢেলে সাজাতে পারব। নতুন করে পৃথিবীর ইতিহাস রচিত হওয়ার পূর্বেই, ইতিহাসকে দেখতে পারব মুসলিমদের আয়নায়।

বিষয়টি হয়তো কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। তা ছাড়া, এটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যথায় আমাদের তরুণ-প্রজন্ম পশ্চিমাদের ইসলাম-বিরোধী উপকরণ দ্বারা আক্রান্ত হতেই থাকবে। আর তাদের মধ্যে বাড়তে থাকবে হীনমন্যতার জটিলতা। মুসলিমরা যদি পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং জীবন থেকে ইসলামকে মুছে ফেলে, তবে এই

জটিলতা কখনোই কাটবে না। তারা কি উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত নয়?

আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিমাদের সমস্ত ধ্যানধারণার চাইতে ইসলামের রীতিনীতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধ, ইনসাফ এবং স্বাধীনতা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ। আসলে পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের এই বিশ্বাসকে আরও জোরালো করে তোলে। বর্ণবাদকে[৭৪] ইসলাম ঘৃণার চোখে দেখে। মানুষের সাম্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধকে বেশি জোর দেয়।[৭৫]

---

[৭৪] বর্ণবাদ একটি চরম উদ্ভট তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, পৃথিবীর সব জাতির সমানভাবে উন্নত হওয়ার অধিকার নেই। যেই জাতির রক্ত বিশুদ্ধ, কেবল তারাই উন্নতি করবে। কেবল তারাই শাসন করবে গোটা বিশ্বকে। এটা তাদের নৈতিক অধিকার। ইতিহাস আমাদেরকে বলে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর শোষণের ফলেই জাতিতে জাতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই পার্থক্যকে জিইয়ে রাখার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা বর্ণবাদ তত্ত্বের জন্ম দেয়। আর এর মূল হোতা হিসেবে কাজ করে সোশ্যাল ডারউইনিজম। ডারউইন বলেছিল, পৃথিবীতে তারাই টিকে থাকবে যারা বেশি দাপটশালী। অপেক্ষাকৃত দুর্বলরা নাকি বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছে। ডারউইনের এই তত্ত্ব ছিল বর্ণবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। আমেরিকার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী Stephen Jay Gould বলেন: "এই (তত্ত্বের) ফলে দাসপ্রথা, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ, শ্রেণী সংগ্রাম, লিঙ্গ বৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার বিজ্ঞানের নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।" [Gould, *The Mismeasure of Man*, p. ৭২]

এর ফলাফল আমরা ইতিহাস জুড়ে দেখতে পাই। নীরিহ ল্যাটিন আমেরিকনাদের সাথে কলম্বাস ঠিক একই আচরণ করেছে। নেটিভ আমেরিকানদেরকে সে কৃতদাস হিসেবে ব্যবহার করে। গরু-ছাগলের মতো নেটিভদের ধরে ধরে হত্যা করে। এ সকল নিষ্ঠুরতার কারণ হচ্ছে—ওরা 'বর্বর'। ইউরোপীয়রা ঔপনিবেশবাদের মাধ্যমে জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকে প্রাচ্যের দেশগুলো। কারণ, প্রাচ্য সভ্য নয়, ওদেরকে জোর করে সভ্য বানাতে হবে। কার্ল মার্কসের মতো তথাকথিত সাম্যবাদীর মুখ দিয়েও এই কথা বের হয় : "ওরা নিজেদের প্রতিনিধত্ব করতে পারে না। অবশ্যই ওদের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।" [বিস্তারিত : Edward Said, *Orientalism*] বর্ণবাদের প্রভাব আমরা এখনো ইউরোপের দেশগুলোতে দেখতে পাই। সাদা চামড়ার ফিরিঙ্গিরা প্রায়শই কালো মানুষগুলোকে হত্যা করে নির্বিচারে। - (অনুবাদক)

[৭৫] ইসলামে সাদা-কালো, ধনী-গরিব, আরব-অনারব ইত্যাদি পরিচয়ের আলাদা কোনো মূল্য নেই। এসবের ওপর ভিত্তি করে মানুষকে সম্মান কিংবা অসম্মান করা হয় না। মুসলিমদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য কখনো দেশ, ভাষা, বর্ণ কিংবা গোত্রের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। সকল ক্ষেত্রে মর্যাদার ভিত্তি হলো 'তাকওয়া' বা 'আল্লাহভীতি'। যে যত বেশি আল্লাহভীরু, যে তত বেশি সম্মানিত। এই মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন বলেছে : "হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক তাকওয়াবান।" [সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩] – (অনুবাদক)

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনো তার বর্ণবাদী এবং জাতীয়তাবাদী[৭৬] সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে সরে আসতে পারেনি। ইসলামি সমাজে কখনো শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটেনি। অথচ প্রাচীন গ্রিস ও রোম থেকে নিয়ে বর্তমান জমানা পর্যন্ত, পাশ্চাত্যের ইতিহাস শ্রেণী সংঘাত ও সামাজিক সহিংসতা দিয়ে ভরপুর।

বারবার আমাদেরকে এটার পুনরাবৃত্তি করতে হবে যে, পশ্চিমাদের কাছ থেকে স্রেফ একটি বিষয়ই মুসলমানদের শিখে নিতে হবে। তা হলো, নির্ভেজাল এবং প্রায়োগিক বিজ্ঞান। কিন্তু ওদের কাছ থেকে বিজ্ঞান শেখার প্রয়োজনীয়তা, একজন মুসলিমকে যেন ইসলামি সভ্যতার চাইতে পশ্চিমা সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে প্ররোচিত না করে। যদি সে প্রভাবিত হয় তবে বুঝতে হবে, ইসলামের হাকিকত সে বোঝেনি।

একটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব কখনো বৈজ্ঞানিক প্রাচুর্যের ওপর নির্ভর করে না। নৈতিকশক্তি এবং জীবনের নানান দৃশ্যপটকে বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করতে পারার সক্ষমতার ওপর এটা নির্ভরশীল। এটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে ইসলাম অন্যান্য সকল সভ্যতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। মানবজাতি উৎকর্ষতার যে সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছতে চায়, সেখানে যাওয়ার জন্যে অবশ্যই ইসলামের বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে। আমরা যদি ইসলামি মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই এবং এর পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখি, তবে অবশ্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ বাদ দিতে হবে। কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব ইসলামের যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে, তার তুলনায় এটা থেকে প্রাপ্ত দুনিয়াবি ফায়দা তো কিছুই না।

অতীতকালের মুসলিমরা যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে অবহেলা করতেন[৭৭],

---

[৭৬] জাতীয়তাবাদ বলতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর আলাদা আলাদা আদর্শকে বোঝায়। একটি দেশ নির্ধারিত কোনো আদর্শকে সামনে রেখে, তার নাগরিকদের সেটার দিকে আহ্বান করে। সেই আদর্শকেই অন্যান্য সকল কিছুর চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এমনকি সেই আদর্শের জন্যে জীবন বাজি রাখতেও জনতাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। নিজ দেশের উন্নতির জন্যে যে-কোনো কাজ করা জাতীয়তাবাদী আদর্শ অনুসারে বৈধ। এমনকি সেটা অন্য রাষ্ট্রের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে হলেও। - (অনুবাদক)

[৭৭] এখানে কথাটা উপমা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে। অতীকালের মুসলিম বিজ্ঞানীদের কীর্তিগাথা

তবুও ভুল সংশোধনের আশায় বর্তমান জমানার মতো কখনোই পশ্চিমাদের অনুকরণ করতেন না। পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণের ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে মুসলিম-বিশ্বের চিন্তা-চেতনার ওপর।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে, নীতিভ্রষ্ট পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই সভ্যতা চুপিসারে কেবল আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেই প্রবেশ করেনি, ঢুকে পড়েছে আমাদের সমাজ-কাঠামোতেও। মুসলিমরা আজ পশ্চিমাদের আচার-আচরণ ও জীবন-যাপন হুবহু নকল করছে। ফলে পাশ্চাত্যের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আস্তে আস্তে নিজেকে খাপ খাওয়াতে বাধ্য হচ্ছে। আসলে কোনো ধ্যানধারণার বাহ্যিক অনুসরণ ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, শেষমেশ ওই ধারণা অনুযায়ী আমরা গোটা বিশ্বকে দেখতে বাধ্য হই।

নিয়ে শতাধিক খণ্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া লেখা যাবে। - (অনুবাদক)

অনুকরণের বেড়াজাল

মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে ইসলামি সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, এবং রেনেসাঁর পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ। কয়েক দশক পূর্বে এই সাংস্কৃতিক ব্যাধি শুরু হয়। হ্যাঁ, একে ব্যাধিই বলতে হয়। পশ্চিমাদের দুনিয়াবি প্রতিপত্তি ও উন্নতির সাথে মুসলিমরা নিজেদের শোচনীয় সামাজিক অবস্থার তুলনা করে চলছিল। তাদের নৈরাশ্য থেকেই এটির উৎপত্তি। মুসলিমরা একদিকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে অবহেলা করতে শুরু করেছিল। এর সাথে যুক্ত হয় আলিম নামধারী কিছু লোকের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য এদের দায়টাই বেশি। এই দুই দলের কারণে এমন ধারণার জন্ম হয় যে, পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নয়তো মুসলিমরা কিছুতেই বাকি দুনিয়ার উন্নতির সাথে পাল্লা দিতে পারবে না।

মুসলিম-বিশ্ব ছিল স্থবির অবস্থায়। আর অনেক মুসলিম এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত প্রগতির জন্যে উপযুক্ত নয়। তাই একে পাশ্চাত্যের আদলে সংস্কার করতে হবে। ওইসব 'পণ্ডিতরা' কখনো ভেবে দেখার চেষ্টা করেনি—মুসলিমদের শোচনীয় অবস্থার জন্যে ইসলামের শিক্ষা আসলে কতটুকু দায়ী। ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে তারা কখনো জানার চেষ্টা করেনি। কেবল সমসাময়িক আলিমদের মতামতকে দুনিয়াবি প্রগতি এবং বস্তুগত উন্নতির অন্তরায় মনে করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো তাদের দাবি যথার্থ ছিল। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর মতো মূল উৎসের দিকে নজর দেওয়ার বদলে, তারা

চুপিসারে বাছাই করেছে ইসলামের আইনশাস্ত্র তথা শারীয়া এবং বর্তমান সময়ের জটিলতম ফিকাহকে। অথচ যুগ-সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়নি। ফলে শারীয়ার ওপর তারা বাস্তবিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। আর একে ঠাঁই দিয়েছে ইতিহাসের পাতায় ও জ্ঞানের তাত্ত্বিক জগতে।[৭৮] সে জন্যেই তারা মনে করে : মুসলিম-বিশ্বের অবক্ষয় ও পতন থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো পশ্চিমাদের অনুকরণ।

আদতে এটা ছিল পথভ্রষ্টতা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ধরে এসব পণ্ডিতদের পক্ষে সাফাই গেয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লেখা হয়। সেগুলো ছিল অত্যন্ত নিম্ন মানের। এসব প্রবন্ধে অবশ্য ইসলামের বাস্তব শিক্ষাকে খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করা হয়নি। তবে এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে, ইসলামের আদর্শ পশ্চিমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারণার অনুগামী হতে পারে। এভাবেই মুসলিমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণের পক্ষে উকালতি করতে থাকে। যার ফলে ইসলামের অত্যাবশ্যক সামাজিক মূলনীতিগুলো ধীরে ধীরে মুছে যেতে শুরু করে। আর এর নাম দেওয়া হয় 'প্রগতি'। একেই আজকালকার মুসলিম দেশগুলোর ক্রমবিকাশের প্রতীক মনে করা হয়।

তথাকথিত কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবী বলে থাকে : আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো জীবন-যাপন করব। মনোমতো কাপড় গায়ে দেব। চাই সেটা পাশ্চাত্যের আদলে হোক বা আমাদের সালাফদের মতো। তাতে কী আসে যায়! রীতিনীতির ক্ষেত্রে আমরা রক্ষণশীল হতেও পারি, নাও হতে পারি। এগুলো

[৭৮] আবু হানিফা থেকে নিয়ে ইবনু তাইমিয়্যা (রাহিমাহুমুল্লাহ) পর্যন্ত যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখব, তাঁরা প্রত্যেকেই যুগ-সমস্যার মোকাবিলা করেছেন। সমসাময়িক সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়েছেন। কিন্তু আজ আমরা তাদের সেই স্পিরিট থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের যুগের যেসব নিত্যনতুন সমস্যা এসে উপস্থিত হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। সময় নষ্ট করছি মতবিরোধপূর্ণ কিছু মাসলা-মাসায়েল নিয়ে। অথচ এগুলোর সমাধান সালাফরা দিয়ে গেছেন বহুকাল আগেই। ফেমিনিজম, ক্যাপিটালিজম, ন্যাশনালিজম, মার্ক্সিজম ইত্যাদি শিরকি মতবাদ আমাদের যুব সমাজের ঈমান কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু বর্তমান জমানার ফিকহের কিতাবে এগুলোর খুঁটিনাটি আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে না। ইসলামের তাত্ত্বিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে বহু জায়গায়। কিন্তু তাত্ত্বিক জ্ঞানকে কিভাবে বাস্তব রূপ দিতে হয়, তা আজ অনেকেরই অজানা। কিছু ঈমান-দৃপ্ত তরুণ যখন নিজ ইচ্ছায় যুগ-সমস্যার ইসলামি সমাধান তালাশ করেছে, তখন তারা হতাশ হয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে সেক্যুলার জগতে। সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছে পশ্চিমা দার্শনিকের কিতাবাদিতে। - (অনুবাদক)

আমাদের আধ্যাত্মিকতার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

এই ধরনের যুক্তিতর্ক আসলে বিপথগামীদের কাজ-কারবার। কোনো ধরনের সংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনার স্থান ইসলামে নেই। ইসলাম মানুষের জন্যে সম্ভাবনার এক বিশাল দুয়ার খুলে রাখে। এই দুয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত খোলা, যতক্ষণ না দ্বীনের কোনো বিধান লঙ্ঘন হচ্ছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। পশ্চিমা সমাজ-কাঠামোর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক ইসলামি শিক্ষার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। যেমন : নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে পুঁজির ওপর সুদ ধার্য করা ইত্যাদি।[৭৯] মানুষের ধর্মীয় আবেগ, পশ্চিমা সভ্যতা ব্যহত করে। এটা তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আমি তা পূর্বেই দেখানোর চেষ্টা করেছি। কেবল নাদান ব্যক্তিরাই বলতে পারে : "কোনো সভ্যতার চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, শুধু ওপরে ওপরে তাকে অনুসরণ করা যায়।" সভ্যতা কোনো ঘোড়ার ডিম নয়। এর প্রাণ আছে। যখনি আমরা তার বাহ্যিক কোনো অংশের অনুসরণ করব, এর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও চলমান প্রভাব আমাদের ওপর কাজ করতে শুরু করবে। ধীরে ধীরে পুরো চিন্তার জগৎকে সে দখল করে নেবে। নবিজির হাদীসের মাধ্যমে ব্যাপারটির আরও পষ্ট হয় : "যে ব্যক্তি কোনো কওমকে অনুকরণ করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত।" [মুসনাদে আহমাদ, ২/৫০; আবু দাউদ, ৪০৩১]

এই পরিচিত হাদিসটি কেবল মৃদু ধমকিই নয়, বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার পদক্ষেপও বটে। মুসলিমরা বাহ্যিকভাবে কোনো অমুসলিম সভ্যতার অনুসরণ করতে থাকলে, একসময় তাদের মতোই হয়ে যাবে। এই অনিবার্য বাস্তবতা হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টি সামনে রেখে বলা যায়, 'গুরুত্বপূর্ণ'

---

[৭৯] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ৯ নং পাদটীকা)** : এই ক্ষেত্রে, যৌনতার পরিপূর্ণ বৈধতা, পতিতাবৃত্তি ও উশৃঙ্খলতা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যেভাবে ব্যাপকহারে পাশ্চাত্য সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে, (সে তুলনায়) ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট এবং এর ব্যাপারে মন্তব্য করার মতো কিছুই নেই। আধুনিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ—সুদী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এটা লক্ষণীয় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিম-সমাজ সুদবিহীন ব্যাংকিং-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। এর মধ্য দিয়ে পৃথক একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও (দাঁড় করিয়েছে), যা শারীয়ার আলোকে পরিচালিত হবে।

ও 'গুরুত্বহীন' দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে সামাজিক জীবনে কোনো মৌলিক তফাত নেই। এদিক থেকে বললে, আসলে কোনো জিনিসই 'গুরুত্বহীন' নয়। এই যেমন পোশাকের কথাই ধরুন। "পোশাক বাহ্যিক উপকরণ। একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাব নেই"—এই ধারণা পুরোপুরি গলদ। পোশাক হলো বহুকাল ধরে চলে আসা মানুষের অভিরুচি এবং চাহিদার বহিঃপ্রকাশ। পোশাকের ধরন মানুষের নান্দনিকতার পরিচয় বহন করে। মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও মন-মননের ভিত্তিতে পোশাকের ধরন বদলাতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমাদের নিত্যনতুন ফ্যাশন তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক চরিত্রের নিদর্শন।

একজন মুসলিম নিজের পোশাক-আশাক ছেড়ে পাশ্চাত্যের ফ্যাশন নকল করার মাধ্যমে নিজের অজান্তেই ওদের অভিরুচি গ্রহণ করে নিচ্ছে। আর নিজের নীতি-নৈতিকতা ও চিন্তা-চেতনাকে এমনভাবে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলছে, যেন তা নতুন পোশাকের সাথে খাপ খায়। এভাবেই সে তার আপন মানুষদের সাথে সাংস্কৃতিক লেনাদেনা চুকিয়ে ফেলছে। তাদের ঐতিহ্যবাহী রুচিবোধ, নান্দনিকতা, ভালোলাগা ও মন্দলাগার বিষয়কে পরিত্যাগ করছে। আর চিন্তা-চেতনা ও নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে গোলামি করছে ফিরিঙ্গি সভ্যতার। ব্যাপারটিকে অন্যভাবেও বলা যায়। একজন মুসলিম যদি পশ্চিমাদের পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ ও জীবন-যাপনকে অনুসরণ করতে থাকে, সে যেন তার সভ্যতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে মুনাফিকি করল। সে যদি প্রকাশ্যে তার সভ্যতাকে সত্য বলে স্বীকার করেও থাকে, তবুও। ভিনদেশী সভ্যতার মৌলিক রীতিনীতি গ্রহণ না করে একে অনুসরণ করাটা, বাস্তবে সম্ভব নয়। তেমনিভাবে, একটি ধর্ম-বিদ্বেষী সভ্যতার রীতিনীতি অনুসরণ করে নিজেকে ভালো মুসলিম দাবি করাটাও সমানতালে অসম্ভব।[৮০]

---

[৮০] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ১০ নং পাদটীকা)** : এই ক্ষেত্রেও পাঠকদের মনে রাখতে হবে যে, বইটি প্রায় পাঁচ দশক পূর্বে লেখা হয়েছে। ওই সময়ে হয়তো মুসলিম সমাজের জন্যে তাদের সাংস্কৃতিক মর্যাদা যেমন : ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও বাহ্যিক অভিব্যক্তি—দৃশ্যত পাশ্চাত্য সমাজ থেকে স্বতন্ত্র রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলোতে মুসলিম-সমাজ পাশ্চাত্যের রীতিনীতি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে বহু মুসলিম, বিশেষ করে যারা উচ্চশিক্ষিত, তারা ফিরে না-আসার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। তাদের কাছে আজ

মূলত হীনমন্যতার কারণেই ফিরিঙ্গি সভ্যতার অনুকরণের প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। যেসব মুসলিমরা পশ্চিমাদের অনুসরণ করে, তার পেছনেও এটাই কারণ। পশ্চিমাদের ক্ষমতার দাপট, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও ধবধবে চেহারার সাথে তারা দুর্দশাগ্রস্ত ইসলামি বিশ্বের তুলনা করে। আর বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, এই জমানায় পশ্চিমাদের দেখানো পথ ছাড়া (উন্নতির) আর কোনো রাস্তা নেই। নিজেদের অক্ষমতার জন্যে ইসলামকে দায়ী করাটা আজ আমাদের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কৈফিয়ত দিতে বড্ড পটু। তারা নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে বোঝাতে থাকেন : পশ্চিমা মূল্যবোধের সাথে মানিয়ে চলাটা ইসলাম-বিরোধী কোনো কাজ না।

মুসলিম-বিশ্বের পুনর্জাগরণের জন্যে কোনো ধরনের বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে, নিজেদের দ্বীন ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে কাঁচুমাচু করার মানসিকতা একদম ঝেড়ে ফেলতে হবে। মুসলিমকে অবশ্যই মাথা উঁচু বাঁচতে শিখতে হবে। তাকে বুঝতে হবে, পুরো দুনিয়ার চেয়ে সে আলাদা। তার উচিত এই স্বকীয়তা নিয়ে গর্ব অনুভব করা। অন্ধের যষ্ঠি মনে করে একে আগলে রাখতে হবে। এই ব্যাপারে কোনো প্রকার দোনোমনো করা চলবে না। অন্য কোনো সংস্কৃতির সাথে না গুলিয়ে, একে বীরের মতো তুলে ধরতে হবে বিশ্ববাসীর সামনে।

তার মানে এই না যে, মুসলিমরা নিজেদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে রাখবে। নতুন নতুন ইতিবাচক গুণগুলো অন্যান্য সভ্যতা থেকে গ্রহণ করা যায়। তবে কোনোমতেই নিজের সংস্কৃতি ছাড়া যাবে না। এর একটি উদাহরণ হতে পারে ইউরোপীয় রেনেসাঁস। সেখানে আমরা দেখতে পাই, আরবদের জ্ঞানচর্চার উপকরণ ও পদ্ধতি ইউরোপ অনায়াসে গ্রহণ করেছে। কিন্তু আরবদের বেশভূষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা কখনোই অনুসরণ করেনি। নিজেদের নান্দনিকতা ও চিন্তার স্বাধীনতাকে বলি দেয়নি একটুও। আরবদের প্রভাবকে তারা শুধু নিজেদের ভূমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

পূর্ববর্তীদের পোশাক-আশাক ও বাহ্যিক হাবভাবে ফিরে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল ও সেকেলে (ধ্যান-ধারণার) অনুকরণ ছাড়া কিছুই মনে হয় না। এক্ষেত্রে (তারা পূর্বসূরিদের অনুকরণকে) একটি প্রাণহীন এবং অপ্রত্যাবর্তন-যোগ্য অতীতের অনুসরণ (হিসেবে ধরে নিয়েছে)।

যেভাবে আরবরা একসময় কাজে লাগিয়েছিল হেলেনিস্টিক প্রভাবকে। যার ফলে, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী নতুন সভ্যতার উত্থান দেখতে পাই। যারা আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদায় বলীয়ান ছিল। আত্মমর্যাদা ও অতীত (গৌরবের) সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ছাড়া কোনো সভ্যতাই উন্নতি করতে পারে না। এমনকি অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখতে পারে না।

পাশ্চাত্যের অনুকরণ এবং এর ভাবাদর্শকে আপন করে নেওয়ার ফলে, ইসলামি বিশ্ব তার অতীত থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। যারা ফলে তার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার মূলে পচন ধরতে শুরু করেছে। তার অবস্থা যেন ওই গাছের মতন, যার শেকড় মাটির গভীরে থাকা অবস্থায় সে জোরদার ছিল। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার পাহাড়ি জলস্রোত এসে শেকড়কে আলগা করে দিয়েছে। ফলে পুষ্টির অভাবে ধীরে ধীরে গাছটি নেতিয়ে পড়ছে। এক-এক করে ঝরে পড়ছে তার পত্রগুচ্ছ। ডালপালা শুষ্ক হয়ে আসছে। দিনশেষে এর গুড়ি উপড়ে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মুসলিম-বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্যে পশ্চিমাদের অনুকরণ কখনোই সঠিক পন্থা হতে পারে না। (এই জড়তার) কারণ হচ্ছে, বাস্তবধর্মী একটি দ্বীনকে নিছক প্রাণহীন কিছু রীতিনীতিতে পরিণত করা। এবং নীতি-নৈতিকতা ও জীবনের আঙিনা থেকে একে মুছে ফেলা। তাহলে আজকের মুসলিমরা-যে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণশক্তির অভাব বোধ করছে, এর (সমাধানের) জন্যে তাদের কোথায় তাকানো উচিত?

এর উত্তর প্রশ্নের মতোই সোজাসাপ্টা। অবশ্য উত্তরটা লুকিয়ে আছে প্রশ্নের মধ্যেই। ইতিপূর্বে বহুবার এটা বলেছি, ইসলাম স্রেফ 'অন্তরের বিশ্বাসের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের জন্যে বাতলে দেওয়া একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই যে-সভ্যতার মূল্যবোধের মাপকাঠি ভিন্ন, এমন কারও সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেললে, এটি আপনাআপনিই ধসে পড়বে। যখনি একে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা হবে, আর ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে একে প্রাধান্য দেওয়া হবে, তখনি এর

পুনরুত্থান ঘটবে। বর্তমান জমানাতে নিত্যনতুন ধ্যানধারণা ও ভাবাদর্শ একে অপরের সাথে টক্কর দিচ্ছে। তাই ইসলাম স্রেফ নামকাওয়াস্তে কোনো ধর্ম হয়ে থাকতে পারে না। তার বহু শতাব্দীর ঘুমের মায়াজাল কেটে গিয়েছে। এখন শুরু হয়েছে বাঁচা-মরার লড়াই।

মুসলিমরা আজ যে-সমস্যার সম্মুখীন, তার সাথে তুলনা দেওয়া যায় একজন মুসাফিরের। সফর করতে করতে সে এমন এক রাস্তায় এসে পৌঁছেছে, যেটা আড়াআড়িভাবে দুইদিকে চলে গিয়েছে। চাইলে সে ওখানটাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এর ফলাফল হলো অনাহারে ধুকেধুকে মৃত্যু। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে যে-পথ চলে গিয়েছে, সেটা ধরেও সে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে তাকে তার অতীত জীবনটাকে চিরকালের জন্যে বিদায় জানাতে হবে। অপর পথটি চলে গিয়েছে সত্যিকার ইসলামের দিকে। সে চাইলে এটিও বেছে নিতে পারে। কিন্তু এই পথ শুধু তাদেরকেই আহ্বান করে, যারা নিজেদের অতীতে বিশ্বাসী। পাশাপাশি সেই অতীতকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতে রূপান্তর করতে চায়।
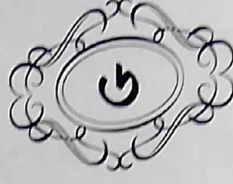
হাদীস এবং সুন্নাহ

শেষ দশকগুলোতে বহু ধরনের সংস্কার-প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। ইসলামের রুগ্ন দেহকে সুস্থ করে তোলার জন্যে অনেক রুহানি চিকিৎসক কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজ অবধি তাদের কোনো চেষ্টাই সফল হয়নি। কারণ, রোগীর প্রাথমিক উন্নতি যেসব প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল, অতিচালাক ডাক্তাররা তাদের নিজস্ব ওষুধপথ্যের পাশাপাশি সেগুলো বাতলে দিতে ভুলে গিয়েছেন। অন্তত যাদের কথা আজকাল বেশি শোনা যায়, (তারাও একই কাজ করেছেন)।

ইসলামের সুস্থ বা রুগ্ন দেহ কেবলমাত্র যে খাবারটি ইতিবাচকভাবে গ্রহণ ও আত্তীকরণ করতে পারে, সেটা হলো আমাদের নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ। তেরো শ[৮১] বছর আগেকার ইসলামি জাগরণ বোঝার জন্যে সুন্নাহই হলো একমাত্র চাবিকাঠি। তাহলে আজ নিজেদের অধঃপতন বোঝার জন্যে এটি কেন মুখ্য বিষয় হবে না?

ইসলামের অস্তিত্ব ও উন্নতির অপর নাম হলো সুন্নাহর অনুসরণ। সুন্নাহর অবহেলা, ইসলামের অধঃপতন ও অবক্ষয়ের সাথে জড়িত। সুন্নাহ হলো ইসলাম নামক ঘরের লোহার কাঠামোর মতো। আপনি যদি কোনো ঘরের অবকাঠামোই উপড়ে ফেলেন, তবে তো সেটি তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়বেই। এতে অবাক হওয়ার কী আছে!

---

[৮১] লেখক এখানে তেরো শ বছরের বেশি শব্দটি উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এখন সেটা সাড়ে চৌদ্দ শ'র বেশি হয়ে গিয়েছে। - (অনুবাদক)

সত্যি বলতে কী, আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সুন্নাহর অনুসরণের বিষয়টি আমাদের মাঝে সবচাইতে অপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটা আমরা খুব ভালো করেই জানি। ইসলামি ইতিহাসের সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই একবাক্যে তা স্বীকার করে নেন। অথচ বর্তমান সময়ের বেহাল দশা এবং অপমানের গ্লানি থেকে কেবলমাত্র এই সত্য জিনিটিই আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে।

'সুন্নাহ' পরিভাষাটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা, কাজ ও মৌন-সম্মতির মাধ্যমে আমাদের জন্যে যেসব দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন, যেসবকে বোঝানো হয়েছে। তাঁর অপূর্ব জীবন ছিল কুরআনের জীবন্ত নমুনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা। তাঁকে অনুসরণ করা ছাড়া, তাঁর ওপর নাযিল হওয়া এই পবিত্র কিতাবের প্রতি আমরা সুবিচার করতে পারব না।[৮২]

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, মানব-জীবনের আধ্যাত্মিক ও বাস্তবিক দিককে ইসলামে পরিপূর্ণভাবে সমন্বয় করা হয়েছে। ইসলামের অন্যতম মহান উদ্যোগ এটি। এই গুণটিই অনান্য অলৌকিক দর্শন থেকে ইসলামকে আলাদা করে দিয়েছে। প্রাথমিক সময়গুলোতে ইসলাম যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই অর্জন করেছে দুর্দান্ত বিজয়। এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল এই সমন্বয়ের

---

[৮২] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ১১ নং পাদটীকা)** : আমি এখানে এই বিষয়টির প্রতি জোর দিতে চাই যে, ইসলামের সোনালি যুগের পরবর্তী সময়কার মুহাদ্দিসগণ আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর ধারণাকে অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করেছেন। মৌলিক সংজ্ঞায়, সুন্নাহ দ্বারা আল্লাহর রাসূলের 'পুরো (নববি) জীবনকে' বোঝানো হয়। এটাই যৌক্তিক। প্রথমত, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের স্থায়ী সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর উপদেশ ও নীতিমালা কেমন ছিল, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, নিত্যনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি ও ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারের সাথে জড়িত নববি বিধি-নিষেধ কী ছিল, সুন্নাহ এই ধরনের হুকুমকেও অন্তর্ভুক্ত করে। বলাই বাহুল্য, বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক উপলক্ষ্য বা পরিস্থির ওপর ভিত্তি করে দেওয়া আল্লাহর রাসূলের হুকুম, স্বভাবতই এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তৃতীয়ত, 'এটা ভালো', 'ওটা খারাপ'—কোনো মানুষের বিশেষ কোনো পরিস্থির সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহর রাসূলের এই জাতীয় পষ্টভাষী নৈতিক মূল্যায়নও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। আর তাই সময় কিংবা পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে এটি প্রজোয্য নয়। নবিজির সুন্নাহর এই তিন প্রকারের সংজ্ঞায়ন মজবুতভাব আঁকড়ে ধরতে না পারলে, আমরা এমন মূলনীতি তরক করার বিপদ ডেকে আনব, যা সব সময়ের জন্যে কার্যকর। এর ফলে, ইসলামি আইনশাস্ত্রে কুরআন-পরবর্তী দ্বিতীয় উৎস 'সুন্নাহ'র মধ্যে আল্লাহ তাআলা যে হাকিকত রেখেছেন, সেটার কিছু অংশ খুইয়ে ফেলব।

ব্যাপারটি। ইসলাম মানুষের কাছে এই নূতন পয়গাম ছড়িয়ে দিয়েছে যে, বেহেশতে যাওয়ার জন্যে দুনিয়াকে অবজ্ঞা করার প্রয়োজন নেই। ইসলামের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যটিই বলে দেয় : মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে, আমাদের প্রিয়নবি কেন আধ্যাত্মিকতা ও বাহ্যিকতা নামক জীবনের দুই মেরু নিয়ে এতটা চিন্তিত ছিলেন। সুতরাং, কেউ যদি ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নবিজির আদেশ মেনে চলে, আর ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে সুন্নাহকে অবহেলা করে—সে আসলে ইসলামকে গভীরভাবে বুঝতে পারেনি। আমরা প্রথম প্রকারের আদেশ মানতে বাধ্য কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাধ্য নই—এগুলো অপরিপক্ব এবং ইসলাম-বিরোধী চিন্তাধারার ফসল। (তারা যেন বলতে চায়) : "কুরআনের অমুক অমুক বিধান তৎকালীন জাহিল আরবদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর[৮৩] রুচিশীল ভদ্রলোকের সাথে এগুলো যায় না।"

এসবের মূলে রয়েছে মুহাম্মাদে আরাবির সত্যিকার অবস্থানের প্রতি চরম গাফিলতি। একজন মুসলিমকে অবশ্যই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দিককে পরিপূর্ণভাবে এবং দ্বিধাহীন-চিত্তে সমন্বয় করে জীবন চালাতে হবে। যাতে করে নবিজির আনুগত্য সমন্বিত সত্তা হিসেবে জীবনে প্রবেশ করে। আর নৈতিক, ব্যবহারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সেটার প্রকাশ ঘটে। এটাই সুন্নাহর মূল তাৎপর্য। কুরআন বলে :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"না, তোমার রবের শপথ! এরা কখনো মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে। তারপর তুমি যা ফয়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো প্রকার দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।" [সূরা নিসা, ৪ : ৬৫]

কুরআন আরও বলে :

[৮৩] বইটি বিংশ শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল। - (অনুবাদক)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

“বলে দাও (হে মুহাম্মাদ), যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। তাদেরকে বলো, ‘তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো।’ তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (জেনে রাখো), নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।” [সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৩১]

সুতরাং কুরআনের পর নবিজির সুন্নাহই হলো ইসলামি শারীয়ার দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে সুন্নাহকে মেনে নিতে হবে চোখ বন্ধ করে। কুরআনি শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী মতবিরোধ এড়ানোর এটাই একমাত্র পন্থা। কুরআনের অনেক আয়াত রূপক অর্থ নির্দেশ করে। এগুলোকে নানাভাবে ব্যাখা করার সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়া জীবন-ঘনিষ্ঠ অনেক প্রশ্নের উত্তর কুরআনে বিশদভাবে দেওয়া হয়নি। পুরো কুরআন জুড়ে বিদ্যমান মর্মবাণী একই। এতে চুল পরিমাণও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কুরআন থেকে খুঁজে বের করা ততটা সহজ নয়। যতদিন আমরা বিশ্বাস করব—এই কিতাব আল্লাহর কালাম এবং গঠনশৈলী ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এটি নির্ভুল, ততদিন আমাদেরকে এই যৌক্তিক সমাধান মেনে নিতে যে, সুন্নাহর কাঠামো বাদ দিয়ে নিজেদের মর্জি-মাফিক নির্দেশ পালনের লক্ষ্যে এই কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। অপরদিকে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি বলে, যার মাধ্যম দিয়ে মানবজাতির ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে, তিনি ছাড়া আর কারোর পক্ষে কুরআনি শিক্ষার সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব না।

হাদীস আমাদের সামনে নবিজির জীবন ও কর্মকে পেশ করে থাকে। এখানে এসে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হই। সেটা হলো, হাদীসের বর্ণনাসূত্রের প্রামাণিকতা। হাদীস বলতে মূলত নবিজির সেসব কথা ও

কাজের বিবরণকে বোঝায়, যা তাঁর সাহাবিদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে এবং বিস্তার লাভ করেছে। আর এসব হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে ইসলামের প্রথম দিককার কয়েক শতাব্দী জুড়ে। অনেক আধুনিক মুসলিম বলে থাকে : "যখন আমরা হাদীসের মূলভিত্তির সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারব, কেবল তখনি সুন্নাহর অনুসরণ করব।" হাদীসের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করাটা আজকাল অনেকের কাছে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে তারা পুরো সুন্নাহর কাঠামোকেও অস্বীকার করে বসছে। এমন দৃষ্টিভঙ্গির নেপথ্যে কি কোনো বৈজ্ঞানিক দলিল আছে? ইসলামি শারীয়ার উৎস হিসেবে হাদীসকে অস্বীকারের পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক ওজর কি তারা দেখাতে পারবে?

অনেকের কাছে মনে হতে পারে—"পূর্বসূরিদের চিন্তাচেতনা-বিরোধী এইসব লোকদের কাছে হয়তো বিশ্বাসযোগ্য কোনো দলিল আছে। যার মাধ্যমে তারা হাদীসকে অনির্ভরযোগ্য হিসেবে সাবিত করতে পারবে।" কিন্তু সত্যিকার অবস্থা তো এর বিপরীত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু আধুনিক সমালোচক সর্ব্বোচ্চ প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে, আজও হাদীসকে অনির্ভর সাব্যস্ত করতে পারেননি। হাদীসকে অনির্ভর সাবিত করা ঘুণাক্ষরেও সম্ভব নয়। কারণ, একটি হাদীস সংগ্রহের পর এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে মানুষের পক্ষে যতটা কঠোর হওয়া সম্ভব, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ তা করেছেন। বিশেষভাবে বুখারি ও মুসলিমের নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের দলিল যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের কঠোরতা এর ধারে-কাছেও নেই।

মুহাদ্দিস তাঁদেরকেই বলা হয়, যাঁরা হাদীস-চর্চায় একান্তভাবে নিয়োজিত। হাদীসের সত্যতা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ যেসব সূক্ষ্ম পন্থা ব্যাবহার করতেন, তা বিশদভাবে বর্ণনা করতে গেলে এ বইয়ের পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, নবিজির হাদীস সংকলনের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। যার একমাত্র লক্ষ্যই ছিল হাদীসের ভাবার্থ, গঠনশৈলী ও বর্ণনাভঙ্গি নিয়ে গবেষণা করা। এই শাস্ত্রের একটি ইতিহাস শাখার উদ্ভাবন

করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল—অবিচ্ছিন্ন সনদে হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ রাখা। এর মাধ্যমে রাবী বা বর্ণনাকারীদের জীবনীকে প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে সূক্ষ্মভাবে যাচাই করা হয়। কেবল তাদেরকেই নির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়, যাদের হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনার ইতিবৃত্ত বিশিষ্ট মুহাদ্দিসদের মানদণ্ডের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এবং বর্ণিত হাদীসটি পুরোপুরি নির্ভুল প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আজ যদি কেউ নির্দিষ্ট কোনো হাদীস বা গোটা হাদীসশাস্ত্রের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চায়, তাহলে অনির্ভরতা প্রমাণের দায় কেবল তার ওপরই বর্তাবে।

কোনো একটি ঐতিহাসিক উৎসের সত্যতা নিয়ে বিতর্ক করা তখনি যথার্থ হতে পারে, যখন কেউ তাকে ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণ করার জন্যে ওঠেপড়ে লাগে। তা ছাড়া (বেহুদা) ওই বিষয়ে তর্কে জড়ানো বিজ্ঞান কখনোই সমর্থন করে না। যদি ওই উৎসের সত্যতার বিপরীতে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি না থাকে, এবং একই বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী কোনো সাবুত না মেলে, তাহলে ওই উৎসের সত্যতা মেনে নিতে আমরা বাধ্য। যেমন মনে করুন, কেউ একজন সুলতান মাহমুদ গজনির ভারত অভিযান নিয়ে কথা বলছে। তখন আপনি বলে উঠলেন, "মাহমুদ কখনো ভারতে এসেছেন, এটা আমি বিশ্বাস করি না। এই কিচ্ছা-কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।" এই অবস্থায় আপনার সাথে কী ঘটতে পারে?

ইতিহাসে পারদর্শী ব্যক্তি, সাথে সাথে আপনার ভুল শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বিখ্যাত সুলতান মাহমুদ যে ভারতে এসেছিলেন, তার প্রমাণ-স্বরূপ তৎকালীন ঐতিহাসিকদের রচিত ঘটনাপঞ্জি আপনাকে বলতে শুরু করবেন। এক্ষেত্রে তার পেশ করা দলিল আপনাকে মেনে নিতে হবে। অন্যথায় মানুষ আপনাকে বলবে ঘাড়ত্যাড়া, যে কিনা সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়াই নিরেট ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করছে। যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের উচিত নিজেকে প্রশ্ন করা—"আধুনিক সমালোচকগণ হাদীস-বিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে কেন একই ধরনের যৌক্তিক মনোভাব পোষণ করেন না?"

হাদীসকে মিথ্যা সাবিত করতে হলে প্রথমে ধরে নিতে হবে—এর প্রাথমিক উৎস অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেছেন। নয়তো

তাঁদের পরবর্তী রাবীগণ মিথ্যা ছড়িয়েছেন। সাহাবিদের ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা প্রথমেই নাকচ করে দিতে হবে। হাদীসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার মনস্তাত্ত্বিক দিকে সূক্ষ্মভাবে নজর দিলে বোঝা যায়, এটি ফ্যান্টাসি ছাড়া কিছুই নয়। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সাহাবিদের ওপর যে-গভীর রেখাপাত করেছিলেন, তা ইতিহাসে বিরল। তা ছাড়া ইতিহাসের পাতায় এগুলো খুব ভালো করেই লিপিবিদ্ধ আছে। যেসব মানুষরা আল্লাহর রাসূলের আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের জানমাল-সহ সকল কিছু কুরবানি করতে প্রস্তুত ছিলেন, তারাই কিনা নবিজির বাণী নিয়ে মিথ্যাচার করবেন? এটা কি ঘুণাক্ষরেও সম্ভব?

নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বলেননি : "যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে, তার স্থান হবে জাহান্নাম?" [সহীহ বুখারি, ১০৭-০৯]

এই হাদীসটি সাহাবিরা খুব ভালো করেই জানতেন। তাঁরা নবিজির কথাকে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করতেন। নবিজিকে মনে করতেন আল্লাহর বার্তাবাহক। আর তাঁরাই কিনা এই মানুষটির নির্দেশ অমান্য করবেন? মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এটা কি হওয়া সম্ভব?[৮৪]

---

[৮৪] এই প্রসঙ্গে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)-এর কিছু কথা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। তিনি বলেছেন, "ওহীর জ্ঞানের নির্ভুল সংরক্ষণের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশ, ওহীর নামে মিথ্যা বা আন্দাজে কথা বলার ভয়াবহ পরিণতি, হাদীসের নির্ভুল সংরক্ষণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিশেষ নির্দেশ ও হাদীসের নামে মিথ্যা বলার নিষেধাজ্ঞার আলোকে সাহাবীগণ হাদীসে রাসূলকে সকল প্রকার অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতাপ্রসূত বা ইচ্ছাকৃত ভুল, বিকৃতি বা মিথ্যা থেকে রক্ষা করার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। প্রথমত, তাঁরা নিজেরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। পরিপূর্ণ ও নির্ভুল মুখস্থ সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত না হলে তাঁরা হাদীস বলতেন না। দ্বিতীয়ত, তাঁরা সবাইকে এভাবে পূর্ণরূপে হুবহু ও নির্ভুলভাবে মুখস্থ করে হাদীস বর্ণনা করতে উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান করতেন। তৃতীয়ত, তাঁরা সাহাবী ও তাবিয়ী যে-কোনো হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীসের নির্ভুলতার বিষয়ে সামান্যতম দ্বিধা হলে তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার পরে গ্রহণ করতেন। এখানে লক্ষণীয় যে, তাঁদের যুগে ইচ্ছাকৃত ভুলের কোনো প্রকার সম্ভাবনা ছিল না। মানুষের জাগতিক কথাবার্তা ও লেনদেনেও কেউ মিথ্যা বলতেন না। সততা ও বিশ্বস্ততা ছিলই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতাপ্রসূত বা অসাবধানতাজনিত সামান্যতম ভুল থেকে হাদীসে রাসূল (ﷺ)-এর রক্ষায় তাঁদের কর্মধারা দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়।" [*হাদীসের নামে জালিয়াতি*, পৃ. ৫৬-৮০]

আদালতে বিচারকের মুখোমুখি হলে সাধারণত এই প্রশ্নটি রাখা হয়—“কার স্বার্থে অপরাধটি ঘটানো হয়েছে?”

হাদীস-সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রেও এই বিচারিক মূলনীতিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেসব হাদীস নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের সম্মানের সাথে জড়িত, পাশাপাশি বানোয়াট—বেশিরভাগ মুহাদ্দিস সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন। নবিজির ওফাত-পরবর্তী প্রথম শতকে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে জড়িত হাদীস ছাড়া, আর কোনো হাদীস জালিয়াতি করার বিশেষ কোনো কারণ নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে জাল হাদীস বর্ণিত হতে পারে ভেবে, বুখারি-মুসলিমের মতো খ্যাতনামা দুই সালাফ তাঁদের সংকলন থেকে দলীয় রাজনীতি-সংক্রান্ত হাদীস কঠোরভাবে বর্জন করেছেন। বাদবাকি (কিতাব)গুলোও কোনোরূপ ব্যক্তিগত সুবিধা প্রদান করেনি কাউকে। আরও একটি কুযুক্তির মাধ্যমে হাদীসের সত্যতাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এমনটা মনে হতে পারে—যে সাহাবি নবিজির জবান থেকে হাদীসটি শুনেছেন বা তাঁর থেকে যে-বিশ্বস্ত রাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি নবিজির কথাকে বুঝতে ভুল করেছেন। কিংবা স্মৃতিবিভ্রাট বা অন্যকোনো মনস্তাত্ত্বিক কারণে তিনি ভুলে গিয়েছেন।

সাহাবিরা কোনো ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ভুল করেছেন, তথ্য-প্রমাণ এ কথার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সাহাবিগণ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আশেপাশেই থাকতেন। নবিজির প্রতিটি কথা ও কাজকে তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তবে নবিজির সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁরা এমনটি করেননি। বরং তাঁরা এই ইয়াকীন রাখতেন যে, জীবনটাকে নবিজির দেখানো তরিকা-মতো চালাতে হবে। এটাই আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। এ কারণে তাঁরা নবিজির হাদীসকে হালকাভাবে নেননি। ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধাকে দূরে ঠেলে, হাদীসকে নিজেদের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছেন। বর্ণিত আছে, নবিজির অতি নিকটবর্তী সাহাবিগণ দুই-দুই জনের একটি জামাত বানিয়ে নিতেন। একজন যখন আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যে কাটাতেন, অন্যজন তখন রুটিরুজি কিংবা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর নবিজির কাছ থেকে যা কিছু শুনতেন এবং যা যা তাঁকে

করতে দেখতেন, তা একে-অপরের কাছে পৌঁছে দিতেন। পাছে নবিজির কোনো কথা বা কাজ অগোচরে চলে যায়, তাই তাঁরা এতটা উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এতটা সতর্ক হওয়ার পরেও হুবহু হাদীস স্মরণ রাখার ব্যাপারে তাঁরা মনোযোগী হবেন না, এটা তো ঘুণাক্ষরেও সম্ভব নয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উচ্চারণ-সহ পুরো কুরআনকে কয়েক শ সাহাবি মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। তাহলে তাঁদের জন্যে এবং তাঁদের অনুসারীদের জন্যে কোনো প্রকার কাটছাঁট ছাড়াই নবিজির প্রতিটি হাদীস ইয়াদ রাখা অসম্ভব কিছু না। খুব সহজেই এটা হতে পারে।[৮৫] তা ছাড়া পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ কেবল ওইসব হাদীসকেই সহীহ বলতেন, যেগুলোর 'মতন'[৮৬] এক কিন্তু একাধিক ভিন্ন 'সনদ'[৮৭]-এ বর্ণিত হয়েছে। স্রেফ এতটুকুই নয়। হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হতে

---

[৮৫] সাহাবিগণ নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিটি কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তাঁর কাছ থেকে কুরআন ও হাদীস শিখতেন মূলত মসজিদে। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চলে যাওয়ার পর সাহাবিগণ নিজেরা মিলে সেগুলো আবার তালিম করতেন। মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ প্রক্রিয়াটির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্য থেকেও পাওয়া যায় এর প্রমাণ। আর নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খাদেম আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর উক্তি থেকে জানা যায় পুরো প্রক্রিয়াটির সারাংশ। তিনি বলেন, "আমরা ষাটজনের মতো জড়ো হয়ে নবিজির সঙ্গে বসতাম, আর নবিজি আমাদের হাদীস শেখাতেন। পরবর্তী সময়ে কোনো দরকারে তিনি বেরিয়ে গেলে, আমরা নিজেরা নিজেরা মুখস্থ করতাম সেগুলো। মজলিস যখন শেষ হতো, ততক্ষণে হাদীসগুলো যেন আমাদের হৃদয়ে একদম গেঁথে যেত।" [খতীব, আল-জামি, ৪৩খ.] এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ড. আজমীর *Studies in Hadith Methodology and Literature* বইটিতে। সমকালীন প্রকাশন থেকে এটি অনূদিত হয়েছে। - (অনুবাদক)

[৮৬] হাদীসের মূলকথা ও শব্দ-সমষ্টিকে 'মতন' বলে। - (অনুবাদক)

[৮৭] হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র-পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে 'সনদ' বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারী বা রাবীদের নাম একের-পর-এক সজ্জিত থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ সহীহ বুখারির প্রথম হাদীসটির কথা ধরা যাক। এই কিতাবটির সংকলক হলেন ইমাম বুখারি। তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হুমাইদি থেকে, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকমা ইবনু ওয়াক্কাস থেকে, তিনি শুনেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছ থেকে। নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে...।"

বুখারি> হুমাইদি> সুফইয়ান> ইয়াহইয়া বিন সাঈদ> মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম> আলকমা ইবনু ওয়াক্কাস> উমর ইবনুল খাত্তাব = হাদীসের 'সনদ'। "প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে..." = হাদীসের 'মতন'। - (অনুবাদক)

হলে, বর্ণনার প্রতিটি ধাপে দুই বা ততোধিক ভিন্ন সাবুদ এবং বেশি থেকে বেশি রাবীর দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়। যাতে কেবল একজন ব্যক্তির বর্ণনার ওপর নির্ভর করতে না হয়। সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে এই অনুসন্ধানের পদ্ধতি খুবই সূক্ষ্ম। মনে করুন, হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবা এবং সর্বশেষ সংকলকের মাঝে তিনটি 'প্রজন্ম' রয়েছে। আর ওই সাহাবি থেকে পরবর্তী সময়ে আরও অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এভাবে সেসব বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন সনদে সর্বশেষ সংকলকের কাছে পৌঁছেছে। আর তিনি সেগুলো থেকে অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে হাদীসের মান নির্ধারণ করে থাকেন।

এতকিছুর পরও আজ পর্যন্ত কোনো মুসলিম এটা মেনে নেয়নি, আল্লাহর রাসূলের হাদীস বিশুদ্ধতার দিক থেকে কুরআনের সমপর্যায়ের। আর হাদীসের যাচাই-বাছাই তো কোনো কালেই বন্ধ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন কিতাবে বিদ্যমান অসংখ্য জাল হাদীসের একটিও মুহাদ্দিসদের নজর এড়ায়নি—যেমনটা অমুসলিমগণ এবং কিছু কিছু মুসলিম সমালোচক মনে করে থাকেন। অন্যদিকে সহীহ হাদীস থেকে জাল হাদীস আলাদা করার জরুরত থেকেই হাদীস যাচাই করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূত্রপাত। অন্যসব পূর্বসূরিদের কথা বাদ দিলেও, বুখারি-মুসলিম তো সরাসরি এই পদ্ধতির কর্মনায়ক। তারপরও যদি কোনো জাল হাদীস থেকে থাকে, তাহলে তা গোটা হাদীস-শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করে না। (হাদীস) বর্ণনার তৎকালীন ঐতিহাসিক বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গেলে, 'আরব্য রজনীর' গালগপ্প ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীসকে সহীহ বলেছেন, আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচকই নিয়মানুযায়ী সেগুলো জাল প্রমাণ করতে পারেনি। সহীহ হাদীসকে পুরোপুরি কিংবা আংশিক অস্বীকার করা, আবেগী কথাবার্তা ছাড়া কিছুই না। একচোখা মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অভাবে, তাদের এই হাদীস-অস্বীকৃতির দাবি মুখ থুবড়ে পড়েছে।

বর্তমান জমানার অনেক মুসলিমদের এমন আক্রোশী মনোভাবের মূল কারণ আমাদের কাছে পষ্ট। চিন্তা-চেতনা ও কাজে-কর্মে নবিজির সুন্নাহ'য় উদ্ভাসিত ইসলামের প্রকৃত ভাবধারা থেকে দূরে সরে যাওয়াই এর মূল কারণ। নিজেদের অক্ষমতা এবং ব্যর্থতা ঢাকার উদ্দেশ্যে সুন্নাহর অনুসরণকে

তারা অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করার বৃথা চেষ্টা করে। কেননা, এর ছুতা দিয়ে কুরআনের সমস্ত শিক্ষাকে তারা নিজেদের মর্জিমাফিক ও মনের খায়েশাত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে পারবে। এরা মূলত নৈতিক ও বাস্তবিক এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামের অনন্য নীতিমালাকে একদম মুছে ফেলতে চায়।

পাশ্চাত্যের প্রভাব মুসলিম দেশগুলোতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সময়টাতে কথিত মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের হাদীস অস্বীকার করার আরও একটি গোপন রহস্য আছে। আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ ও পাশ্চাত্যের জীবনবোধ—দুটোকে একসাথে অনুসরণ করা যায় না। অথচ বর্তমান জমানার অনেক মুসলিম পাশ্চাত্যের সকল কিছু গ্রহণ করতে মরিয়া। তারা বহিরাগত সভ্যতার বন্দনা করতে চায়। কারণ এটি বিদেশী, শক্তিশালী, আর বস্তুগতভাবে চাকচিক্যময়। নবিজির পদাঙ্ক ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ কাঠামো অনুসরণে তাদের অনীহার মূল কারণ হলো এই 'পাশ্চাত্যায়ন' (Westernization)। সুন্নাহর অনুসরণ পাশ্চাত্যের মৌলিক চিন্তাধারার একেবারেই বিপরীত। যেসব কথিত মুসলিম পশ্চিমাদের দ্বারা বিমোহিত হয়ে আছে, সুন্নাহকে অপ্রাসঙ্গিক দাবি করা ছাড়া তাদের সামনে তো আর কোনো পথ খোলা নেই। সে কারণেই তারা তাদের মনগড়া দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাহর অনুসরণকে জরুরি মনে করে না। তাদের মতে হাদীসের ভিত্তিই নাকি দুর্বল! এর ফলে কুরআনের শিক্ষাকে ফিরিঙ্গিদের মাপকাঠির সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাখ্যা করাটা খুব সহজ হয়ে যায়।

হাদীসের ঐতিহাসিক নির্ভরতা প্রমাণের মাধ্যমে সুন্নাহ অনুসরণ করার যৌক্তিকতা সাব্যস্তের পাশাপাশি, এর রুহানি ভিত্তিও সমানতালে গুরুত্বপূর্ণ। (নয়তো সমালোচকরা আবার প্রশ্ন করবে)—"ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাহ অনুসরণ করা অপরিহার্য কেন?" "নবিজির জীবনী থেকে উৎসারিত কর্মপদ্ধতি, রীতিনীতি এবং বিধি-নিষেধের কায়দা-কানুন ছাড়া বাস্তবধর্মী ইসলামি শিক্ষার আর কোনো পথ কি খোলা নেই?" "মানলাম তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করাটা কি ব্যক্তি-স্বাধীনতার খেলাফ নয়?"

অবশ্য ইসলাম-বিদ্বেষী সমালোচকরা অনেক আগ থেকেই এসব আপত্তি জানিয়ে আসছে। তারা বলে থাকে, "ইসলামি বিশ্বের এই বেহাল দশার মূল কারণ হলো কঠোরতার সাথে সুন্নাহর অনুসরণ। এই ধরনের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘ মেয়াদে চলতে থাকলে, মানুষের কর্মের স্বাধীনতা ও সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ব্যহত হয়।" আমরা এই আপত্তির মোকাবিলা করতে না পারলে, সামনের দিনগুলোতে এর বড়সড় প্রভাব পড়বে ইসলামের ওপর। সুন্নাহর অনুসরণ-সংক্রান্ত সমস্যার প্রতি আমাদের আজকের মনোভাব, আগামীতে ইসলামের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে দেবে।

আমরা এই বিষয়টি নিয়ে গর্বিত যে, দ্বীন হিসেবে ইসলাম কোনো অযৌক্তিক মতবাদের ওপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং যৌক্তিক কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এটি সব সময় উন্মুক্ত। সুন্নাহ কেন আমাদের ওপর আবশ্যক করা হয়েছে, কেবল এই রহস্য জানার অধিকারই আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। বরং এই আবশ্যকতার পেছনে যৌক্তিক কারণ জানার অধিকারও দেওয়া হয়েছে।[৮৮] জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম 'সমন্বয়' করে চলে। আর সে লক্ষ্য (পূরণের) জন্যে এই দ্বীন নিজেকে সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে পেশ করে। এখানে নতুন কিছু যোগও করা যায় না, আবার কিছু বাদও দেওয়া যায় না। বিভিন্ন মতবাদের সারনির্যাস গ্রহণের সুযোগ ইসলামে নেই। কুরআন-সুন্নাহর স্বীকৃত শিক্ষা, সব জায়গায় আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে। অন্যথায় এসব শিক্ষার কোনো মূল্য থাকবে না। যৌক্তিক দ্বীন হিসেবে ইসলামের ব্যাপারে অন্যতম একটি ভুল ধারণা হলো এমনটা ভাবা—"একজন ব্যক্তি তার মর্জিমাফিক ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলতে

---

[৮৮] ইসলামের সব নিয়ম-কানুন বাহ্যিক দৃষ্টিতে যৌক্তিক নাও মনে হতে পারে। ইসলামের কিছু বিশ্বাসগত দিক আছে, যা কোনো প্রকার যুক্তি ছাড়াই মেনে নিতে হয়। আমরা ইসলাম মেনে চলি যৌক্তিক কারণে নয়, বরং আমাদের রব ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন এই কারণে। হ্যাঁ, ইসলামি বিধিবিধানের যৌক্তিক কারণ থাকতেই পারে। শারঈ সীমার মধ্যে থেকে আকল দ্বারা অনেক বিধিবিধান ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। কিন্তু যে বিধানকে প্রচলিত যৌক্তিকতার মানদণ্ডে ফেলা যাবে না, সেটাকে দূরে ঠেলে রাখার কোনো সুযোগ নেই। চাই আমাদের বোধগম্য হোক বা না-হোক, চাই যৌক্তিক কারণ থাকুক বা না-থাকুক, সর্বাবস্থায় ইসলামের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য। এটার নামই ঈমান। সামনের দিকে লেখক এই বিষয়টা খুব পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছেন। - (অনুবাদক)

পারবে।”

‘যুক্তিবাদ’ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণার ফলেই এমনটা দাবি করা হয়ে থাকে। ‘যুক্তি’ ও বর্তমান সময়ের বুঝ অনুযায়ী ‘যুক্তিবাদের’ মাঝে আমরা বিস্তর ফারাক দেখতে পাই। সকল যুগেই দর্শন এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তির কাজ হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক। “মনের ওপর ধর্ম এমন কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে কি না, যা মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচগোচ ছাড়া সহজে বোঝা যায় না”—এটা খেয়াল রাখা তার দায়িত্ব।

নিরপেক্ষ যুক্তি দ্বিধাহীনভাবে বারবার ইসলামকে সমর্থন জানিয়েছে। তার মানে এটা বোঝায় না যে, কুরআনের সংস্পর্শে আসা প্রতিটি ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করবে। এটা মূলত তার মনমর্জি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আধ্যাত্মিক দ্যুতির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় এই সাক্ষ্য দেবে যে, কুরআনের প্রতিটি জিনিসের পেছনে কোনো-না-কোনো সংগত কারণ আছে। তবে এ কথাও সত্যি যে, এখানে এমন কিছু ধারণা রয়েছে যা আমাদের বর্তমান বুঝ-ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। কিন্তু এগুলোর দ্বারা মানুষের বোধশক্তির ওপরে কোনো প্রকার জুলুম চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে যুক্তির ভূমিকা নিয়ন্ত্রিত। আমরা আগেই তা দেখেছি। বিষয়টি যেন একটি রেজিস্টার যন্ত্রের মতো ‘হ্যাঁ’ কিংবা ‘না’ বলার ভূমিকা পালন করে। কথিত যুক্তিবাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। এটি কেবল নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। চলে যায় কল্পনার জগতে। নির্ভেজাল যুক্তির মতো এটি নিরপেক্ষ ও উদার হয় না। বরং, চরম স্বার্থপর ও উত্তেজনা-প্রবণ হয়ে থাকে। ‘যুক্তি’ তার নিজস্ব সীমারেখা মেনে চলে। কিন্তু ‘কথিত যুক্তিবাদ’ তার উদ্ভট দাবি এবং নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে পুরো দুনিয়াকে আটকিয়ে রাখতে চায়। যেসব ধর্মীয় বিষয় মানুষের বোধশক্তির ঊর্ধ্বে, সেগুলোর সম্ভাবনাকে আংশিক বা পুরোপুরি নাকচ করে দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানের নানান অযৌক্তিক সম্ভাবনাকে সে মেনে নেয়। এই নাম-সর্বস্ব যুক্তিবাদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের ফলেই বহু আধুনিক মুসলিম নবিজির পথনির্দেশনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

মানুষের বোধশক্তির দুর্বলতা প্রমাণের জন্যে আজ আমাদের একজন 'কান্ট'-এর[৮৯] প্রয়োজন নেই। আমাদের বোধিচিত্ত তার আপন প্রকৃতির কারণেই জীবনের ধারণাকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। আমরা তো খুব অল্পই জ্ঞান রাখি।[৯০] আমরা জানি না, অনন্ত কিংবা অনাদি বলতে কী বোঝায়। জীবনের মানে কী, তাও তো আমরা জানি না। গায়েবি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন, যাঁর বোধিচিত্ত হবে জনসাধারণের চেয়ে উত্তম। তিনি হবেন বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং আত্মনিষ্ঠ যুক্তিবাদের অধিকারী। এ কারণেই দরকার এমন একজন নবির, যিনি (ওহি দ্বারা) পরিচালিত হবেন।

যদি আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি—কুরআন আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমরা তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য। তার মানে এই নয় যে, সংগত কারণ অনুসন্ধানের ক্ষমতাকে আমরা উপড়ে ফেলব। নিজেদের জ্ঞানগরিমা ও সামর্থ্য অনুযায়ী এসব ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে যেসব পথনির্দেশনা দিয়েছেন, তার হাকিকত ও প্রাসঙ্গিকতা বোঝার জন্যে সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কোনো ক্ষেত্রে যদি হাকিকত বুঝে না-ও আসে, তখনো তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আমি ব্যাখ্যা করতে চাই। ধরুন, আর্মির একজন জেনারেল কোনো সৈনিককে একটি কৌশলগত অবস্থান দখলে রাখার আদেশ দিয়েছেন। সৈন্যটি চৌকস হলে সেই আদেশ অনুসরণ করে সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করবে। আদেশ পালনরত অবস্থায় সে যদি নিজে থেকেই জেনারেল সাহেবের পরিকল্পনা বুঝতে পারে, তাহলে সেটা তার

---

[৮৯] পুরো নাম ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant)। জন্ম ১৭২৪, মৃত্যু ১৮০৪ খ্রি.। কান্টের প্রচারিত দর্শনকে বলা Kantism বা কান্টবাদ। তার মতে, জ্ঞানের উপাদানকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, তা অন্তর্জাত নাকি বাইরের কোনো প্রাকৃতি হতে ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ। এটাই কান্টের দার্শনিক পদ্ধতি—'বিচারবাদ' (Ciricism)। [*পরিভাষা কোষ*, পৃ. ১০৬] – (অনুবাদক)

[৯০] আল্লাহ তাআলা পুরো মানবজাতির জ্ঞানকে খুবই সামান্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "আর তোমাদেরকে খুব অল্পই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।" [সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৮৫] – (অনুবাদক)

এবং তার ক্যারিয়ারের জন্যে কল্যাণকর হবে। আর যদি হাকিকত তার কাছে পষ্ট নাও হয়, তবুও আদেশ বাস্তবায়ন করা থেকে সে বিরত থাকতে পারবে না। কিংবা পিছু হটতে পারবে না। আমরা মুসলিমরা, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক নবি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর আস্থা রাখি। আমরা স্বভাবতই বিশ্বাস করি—দ্বীনের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ক্ষেত্র সম্পর্কে তিনি আমাদের চাইতে কোটি গুণে ভালো জানতেন। তাঁর বিধিনিষেধের পেছনে কোনো-না-কোনো কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল। মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্যে তিনি হয়তো ওগুলোকে জরুরি মনে করেছিলেন। কখনো কখনো এই উদ্দেশ্য আমাদের কাছে পষ্ট হয়। আবার দূরদর্শিতার অভাবে কখনো সেটা আড়ালেই থেকে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নবিজির আদেশের হাকিকত আমরা বুঝতে পারি। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষ কারণটাই শুধু বুঝে আসে। যা-ই হোক না কেন, সব সময় আমরা নবিজির আদেশ পালন করতে বাধ্য। কারণ, তাঁর এসব আদেশের প্রাসঙ্গিকতা ও সত্যতা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত।[৯১] এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। হ্যাঁ, নবিজির কিছু আদেশ অন্যান্য আদেশের ওপর প্রাধান্য পেতে পারে। তাই আমরাও তাঁর অগ্রগণ্য নির্দেশগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেব। কিন্তু কোনো বিধানকেই অবহেলা করার সুযোগ নেই, যদিও সেটা আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কেননা আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣

“সে নিজের খেয়ালখুশি-মতো কথা বলে না।” [সূরা নাজম, ৫৩ : ৩]

---

[৯১] **(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ১২ নং পাদটীকা)** : এটার সাথে সাথে পাঠককে ১১ নং পাদটীকা পড়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। পাশাপাশি এও বলা হচ্ছে যে, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে—কিছু কিছু বিশুদ্ধতম হাদীস-সহ এককভাবে অনেক হাদীসই প্রাসঙ্গিক অবস্থার সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াই খণ্ডিত আকারে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এইসব ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কেবল একজন বিদগ্ধ আলিমই সেই অবস্থার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে এর চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারবেন।

তিনি কেবল তখনি কথা বলেন, যখন বস্তুনিষ্ঠ কোনো জরুরত দেখা দেয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই নির্দেশনাই দিয়েছেন। তাই ইসলামের ব্যাপারে আমরা যদি সৎ থাকতে চাই, তাহলে পরিপূর্ণভাবে নবিজির সুন্নাহ অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য।

আমরা এই (নববি) আদর্শকে অনেকগুলো পথের মধ্যে 'একটি' বলে গণ্য করি না। বরং এটিই 'একমাত্র' পথ। আর যিনি আমাদের কাছে এই জীবন-দর্শন পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁকে আমরা অসংখ্য পথপ্রদর্শকদের মধ্যে 'একজন' বলি না। 'একমাত্র' তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁর সমস্ত আদেশ মেনে চলার নামই ইসলামের অনুসরণ। তাঁর সুন্নাহকে বর্জন করার মানে হলো ইসলামের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা।

শেষের কথা

পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে ইসলামের মাখামাখি কখনোই যে কল্যাণ বয়ে আনবে না, পুরো বই জুড়ে আমি তা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু মুসলিম-বিশ্বের শক্তি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, (স্রোতের বিরুদ্ধে) সংগ্রাম করার জন্যে যা যথেষ্ট নয়। এর সাংস্কৃতিক ছিটেফোঁটা যাও বাকি ছিল, সেটাও পশ্চিমা ধ্যানধারণা ও রীতিনীতির চাপে পিষ্ট হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে শোনা যাচ্ছে আত্মসমর্পণের ধ্বনি। আর জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে আত্মসমর্পণ মানে—নির্ঘাত মৃত্যু।

আচ্ছা, ইসলামের অবস্থান আজ কোথায়? আমাদের শত্রুরা এবং আমাদের মধ্যকার পরাজিত মানসিকতার লোকেরা আমাদেরকে এটা বিশ্বাস করাতে চায় যে, ইসলামের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটি কি আসলেই তাই? ইসলাম কি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে? পৃথিবীকে যা দেওয়ার কথা ছিল, ইসলাম কি তা দিয়ে ফেলেছে?

ইতিহাস বলে : মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতি একটি দেহের মতো, যার মধ্যে প্রাণ রয়েছে। প্রাণীদের মতো তাদেরকেও একটি জীবন-চক্রের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। তারা জন্ম নেয়, যৌবনে পৌঁছায়, সেখান থেকে পরিণত বয়সে এসে দাঁড়ায় এবং শেষতক পৌঁছে যায় বার্ধক্যে। গাছপালা যেমন ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়ে, তেমনি সময় ফুরিয়ে গেলে সংস্কৃতিও বিলীন হয়ে যায়। কোনো নতুন সংস্কৃতির জন্যে সে জায়গা ছেড়ে দেয়।

ইসলামের বেলায়ও কি এমনটা ঘটেছে? বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো

এমনটা মনে হতে পারে। নিঃসন্দেহে ইসলামি সংস্কৃতির উত্থান ছিল চমকপ্রদ। মানুষকে নেক-আমল ও কুরবানির প্রতি অনুপ্রাণিত করার সক্ষমতা তার ছিল। এটি বহু জাতিকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং বদলে ফেলেছিল পুরো দুনিয়ার চিত্রকে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটি নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং থমকে যায়। ক্রমান্বয়ে এটি গুরুত্বহীন হয়ে দাঁড়ায়। আর আজ আমরা ইসলামের অবক্ষয় ও অধঃপতন লক্ষ করছি। কিন্তু এভাবেই কি সবকিছু শেষ হয়ে যাবে?

অন্যদের মতো ইসলাম নিছক কোনো সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতির কারিগর সে নিজেই। এটি মানবীয় চিন্তা-ভাবনা ও কর্মদক্ষতার ফসল নয়। এটি সকল যুগের, সকল স্থানের মানুষের জন্যে স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ বিধান। আমরা যদি সত্যিই এটা বিশ্বাস করি, তাহলে তো দৃশ্যপট পুরোপুরি পাল্টে যাওয়ার কথা। যদি ওহির মাধ্যমেই ইসলামি সংস্কৃতি অস্তিত্ব লাভ করে থাকে, তাহলে তো অন্যান্য সংস্কৃতির মতো নির্দিষ্ট কোনো সময় এবং নির্দিষ্ট কোনো যুগের মধ্যে একে সীমাবদ্ধ করার ধারণাকে আমরা মেনে নিতে পারব না।

আজ আমাদের কাছে যেটাকে ইসলামের অধঃপতন মনে হচ্ছে, সেটা আসলে আমাদের অন্তরের কাঠিন্যতা ও শূন্যতা ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের অন্তর এতটাই অলস ও অবশ হয়ে পড়েছে যে, (ইসলামের) চিরন্তন বাণী সেখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে না। মানবজাতির বর্তমান হালচাল দেখে মনে হচ্ছে না—তারা ইসলামের চাইতেও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। ইসলামের চেয়ে উত্তম কোনো নৈতিক ধারণা দিতে তারা আজ অক্ষম। জাতি-রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে ওঠে 'উম্মাহ'-কেন্দ্রিক ভ্রাতৃত্বের যে বাস্তবসম্মত ধারণা ইসলাম দিয়েছে, এই জমানা সেটি স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৯২] এটি ইসলামের

[৯২] প্রতিটি মুসলিম একে অন্যের ভাই। আফ্রিকার গহীন জঙ্গলেও যদি কোনো মুমিন থেকে থাকে, সেও আমাদের ভাই। আমরা তার কল্যাণ কামনা করতে বাধ্য। আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। এই বন্ধনই জুড়িয়ে রাখে পুরো মুসলিম উম্মাহকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।" (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১০)

নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাদীসে বিষয়টি আরও পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়া ও সহমর্মিতার দিক থেকে মুমিনদের উদাহরণ একটি দেহের

মতো এমন কোনো সামাজ-কাঠামো দাঁড় করাতে পারেনি, যার ফলে সমাজের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। এটি মানুষের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও রুহানি চাহিদাকে সমুন্নত করতে পারেনি। সচরাচর মানুষ সে সুখ চায়, সেটাও দিতে পারেনি।

এই সকল ক্ষেত্রে মানবজাতির অর্জন আজও ইসলামি কর্মসূচির ধারে-কাছেও যেতে পারেনি। তাহলে ইসলামকে 'সেকেলে' বলার যৌক্তিকতা কোথায়? এটা কি শুধু এ কারণেই যে, ইসলামের বুনিয়াদ ধর্মতত্ত্বের ওপর প্রতষ্ঠিত, আর ধর্মীয় কায়দা-কানুন আজ ফ্যাশনের বাইরে চলে গিয়েছে?

ধর্মীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি শাস্ত্র ইতিমধ্যেই বাস্তবমুখী এক কর্মপরিকল্পনা দিয়ে রেখেছে। সংস্কার ও প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে মানুষের চিন্তাশক্তি যা কিছু উদ্ভাবন করতে পারে, এটি তার চেয়েও বহুগুণে পূর্ণাঙ্গ, সুনির্দিষ্ট এবং বনী আদমের স্বভাব-প্রকৃতির উপযোগী। যদি এমনটা আমাদের সামনে পষ্ট হয়েই থাকে, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে এটাই কি খুব ওজনদার যুক্তি নয়?

আমাদের কাছে ইসলামে বিশ্বাস করার হাজারও যুক্তি রয়েছে। মানুষের ইতিবাচক অর্জনগুলোই ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ, এসব অর্জন করার বহু আগেই ইসলাম এগুলোর ছবি অঙ্কন করে দিয়েছে। দেখিয়ে দিয়েছে চোখে আঙুল দিয়ে। একইসাথে উন্নতির পথে মানুষের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুলচুক এবং পদস্খলন-ও এর যথার্থতা প্রমাণ করে। কারণ, মানবজাতি এসবকে ত্রুটি-বিচ্যুতি হিসেবে বিবেচনা করার বহুকাল পূর্বেই অত্যন্ত পষ্টভাবে ও দৃঢ়তার সাথে ইসলাম এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক

মতন। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার সমগ্র দেহ তাপ ও অনিদ্রা ডেকে আনে।" [মুসলিম, *আস-সহীহ*, ৬৩৫০] এটাই হলো ইসলামের 'উম্মাহ' কনসেপ্ট। এই ধারণা ইসলাম বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছে হাজার বছর আগে, যখন কিনা পশ্চিমা সভ্যতা আঁধারে সাঁতরে বেড়াচ্ছিল আশ্রয়ের খুঁজে। আজ পর্যন্ত বিশ্ব এর বিকল্প কিছু করে দেখাতে পারেনি। পশ্চিমারা কেবল মুখে মুখেই 'মানবতাবাদ'-এর বুলি আওড়ায়। কিন্তু 'বর্ণবাদ' মিশে আছে তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। প্রায়ই সেটার বিস্ফোরণ ঘটে কোনো কৃষাঙ্গকে হত্যার মধ্য দিয়ে। আর মুসলিমদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ তো জন্মগত। ইরাক, সিরিয়া, আগফান ম্যাসাকার করে দেওয়ার পরেও ওদের মনে একটুও অনুশোচনা আসে না। - (অনুবাদক)

করে দিয়েছে। ইসলামকে নিতান্তই ধর্ম-বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দেখলে, পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে-কেউ এর হিদায়াত অনুসরণ করতে বাধ্য হবে।

যদি আমরা আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি, তাহলে দৃঢ়তার সাথে বলা যায়—ইসলামের পুনর্জাগরণ সম্ভব। 'সংস্কারপন্থী' ইসলামের কোনোই দরকার নেই, যেমনটা অনেক মুসলিম মনে করে থাকে। কারণ, ইসলাম নিজে থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের জন্যে আবশ্যক হলো ধর্মের ব্যাপারে নিজেদের মনোভাব সংস্কার করা। আমাদের অলসতা, অহমিকা, অদূরদর্শিতাকে বদলাতে হবে। মোটকথা ইসলামের কল্পিত ত্রুটি-বিচ্যুতি নয়, সংস্কার করতে হবে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে। ইসলামি পুনর্জাগরণের জন্যে নতুন নতুন মূলনীতি আমদানি করার বিলকুল প্রয়োজন নেই। বরং পূর্বসূরিদের যেসব মূলনীতি আমরা ছেড়ে দিয়েছি, সেগুলোকেই আবার প্রয়োগ করতে হবে। আমরা অন্য সংস্কৃতি দেখে নতুন করে উদ্দীপনা লাভ করতে পারি, ব্যস। কিন্তু ইসলামের নিখুঁত কাঠামোর বিকল্প হিসেবে অনৈসলামিক কিছু গ্রহণ করতে পারি না। চাই সেটা প্রাচ্য থেকে আসুক বা পাশ্চাত্য থেকে। ইসলামের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিধানকে সংস্কার করা যায় না কখনো। এমতাবস্থায় কোনো ধরনের ফিরিঙ্গি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইসলামি ধ্যানধারণা কিংবা সামাজ-কাঠামোর পরিবর্তন আনা হলে, আদতে সেটা হবে ধ্বংসাত্মক ও বিপরীতমুখী চিন্তা-ভাবনা। এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়। হ্যাঁ, পরিবর্তন তো আনতেই হবে। তবে সেটা আমাদের নিজেদের মধ্যে। সেটা অবশ্যই হতে হবে ইসলামের দিকে, ইসলামের বিপরীত দিকে নয়।

কিন্তু এসবের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চিত হলে চলবে না। আমরা জানি, স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে ইসলামি বিশ্ব অনেকাংশেই এর বাস্তবতা খুইয়ে ফেলেছে। আমি এখানে মুসলিমদের অধঃপতনের রাজনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করছি না। এটাকে বাদ দিলে, আমাদের বর্তমান দুরাবস্থার কারণগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমাদের ঈমানি শক্তি ও সৃষ্টিশীলতা ম্লান হয়ে যাওয়া, আর আমাদের ভঙ্গুর

সমাজ-কাঠামো (এর জন্যে দায়ী)। আজ আমরা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যেসব ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি ইসলামি বিশ্বকে একসময় গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিল, আজ তা নিঃশেষ হতে চলছে। আমরা কেবল উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেউ জানে না, এর শেষ পরিণতি কোথায়। আমাদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক সাহস নেই। আমাদের দ্বীন ও সমাজ ধ্বংসকারী বহিরাগত প্রবল জলধারাকে কেউই থামানোর চেষ্টা করছি না। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক শিক্ষাকে ছুড়ে ফেলেছি, দুনিয়ার সামনে তা খোলাসা করিনি। আমরা আমাদের ঈমানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি, অথচ আমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে তা ছিল বেঁচে থাকার প্রেরণা। আমরা (দ্বীন নিয়ে) লজ্জাবোধ করি, কিন্তু তাঁরা গর্ববোধ করতেন। আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক, আর তাঁরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন পুরো দুনিয়ার জন্যে। তাঁরা ছিলেন পূর্ণতার অধিকারী, আমরা অন্তঃসারশূন্য। প্রতিটি চিন্তাশীল মুসলিম এসব দুঃখের কাহিনী জানে। প্রত্যেকেই বহুবার এসব শুনে আসছে। তাই কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—“এসব নিয়ে প্যানপ্যান করার কোনো মানে আছে?”

আমি মনে করি আছে। পতনের লজ্জা থেকে বের হয়ে আসার স্রেফ একটি পথই খোলা রয়েছে—এই লজ্জাকে স্বীকার করে নেওয়া। যতদিন আমরা এই সমস্যা দূর করার উদ্যোগ না নিচ্ছি, আমাদের উচিত শরমের অনুভূতি রাতদিন আমাদের সামনে রাখা। এবং তার তিক্ততা অনুভব করা। নিজেদের থেকে এই নির্মম সত্য লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। “মুসলিম-বিশ্বে তো ইসলামি তৎপরতা বেড়েই চলছে, চার মহাদেশে ইসলামের মিশন চালু রয়েছে, দিনকে দিন পশ্চিমারা ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে পারছে...”—এই ধরনের ফাতরামো করারও কোনো প্রয়োজন নেই। এসব ধাপ্পাবাজি কোনো কাজেই আসবে না। ‘আমরা তলাবিহীন ঝুড়ি নই’—নিজেদেরকে এই বুঝ দেওয়ার জন্যে বেহুদা যুক্তিতর্কের দরকার নেই। কারণ, আসলেই আমাদের ঝুড়ির তলা নেই।

কিন্তু এখানেই কি সব শেষ হয়ে যাবে? না, এমনটা হতে পারে না। দ্বীনের

পুনর্জাগরণের জন্যে আমাদের অন্তরে রয়েছে আকুতি। বর্তমান অবস্থার চেয়ে আরও উত্তম হওয়ার বাসনাও রয়েছে অনেকের মধ্যে। তাহলে আমরা তো আশায় বুক বাঁধতেই পারি—'এখনো সুযোগ আছে'। আমাদের পুনর্জাগরণের পথ এখনো খোলা রয়েছে। যাদের দেখবার মতো চোখ আছে, তাদের সামনে এটা পুরোপুরি দৃশ্যমান।

আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে ইসলাম নিয়ে কাঁচুমাচু করার মানসিকতা নিজেদের মধ্য থেকে ঝেড়ে ফেলা। কেননা, এটি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয়ের অপর নাম। আমরা মূলত মেকি অভিনয়ের মাধ্যমে আমাদের সংশয়কে আড়াল করতে চাই। পরবর্তী পদক্ষেপ হবে—নিজে থেকেই নবিজির সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে (দ্বীনি) চেতনা জাগ্রত করা। কারণ, ইসলামি শিক্ষার বাস্তব রূপকেই মূলত সুন্নাহ বলা হয়। দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারব—পশ্চিমা সভ্যতার কোন জিনিসটি গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত। ভিনদেশী বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শের কাছে ইসলামকে বলি দেওয়ার চেয়ে, আমাদেরকে আবারও ইসলামি আদর্শে পৃথিবীকে বিচার করা শিখতে হবে। অবশ্য এটা সত্যি যে, ইসলামের অনেক মৌলিক লক্ষ্যকে আনাড়িভাবে ভুলভাল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর ফলে যেসব মুসলিমরা নিজেদের ধ্যানধারণা শুধরানোর জন্যে মূল উৎসের নিকট যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না, তাদেরকে ইসলাম ও ইসলামি বিধানের আংশিক বিকৃত চিত্রের মুখোমুখি হতে হয়।

আজকের তথাকথিত 'গোঁড়াপন্থীরা' চর্চার অযোগ্য কিছু প্রস্তাবনাকে ইসলামের মূলনীতি হিসেবে জাহির করেন। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আসলে প্রাচীন নিয়োপ্লেটোনিক যুক্তি-নির্ভর অনুমান ছাড়া কিছুই নয়। হিজরি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের জন্যে এগুলো ছিল আধুনিক ও চলনসই। আজ সেগুলো একেবারেই অচল হয়ে পড়েছে। পশ্চিমা ধারায় শিক্ষিত বেশিরভাগ মুসলিম আরবি ভাষার সাথে অপরিচিত। ইসলামি আইনশাস্ত্রের খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। সে কারণে এসব মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ধ্যান-ধারণাকে তারা হুবহু বিধাতার পরিকল্পনা ভেবে বসে। তাই যেটাকে তারা ইসলামি শারীয়া মনে করেছিল, কথিত গোঁড়াপন্থীদের

অদক্ষতার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে সেটা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

শারীয়া যাতে পুনরায় মুসলিমদের জীবনে উদ্ভাবনী শক্তি হিসেবে ফিরে আসে, সেজন্যে ইসলামের প্রস্তাবনাগুলোকে মূল উৎস সম্পর্কে নিজেদের অর্জিত প্রজ্ঞার আলোকে ঝালিয়ে নিতে হবে। শত শত বছর ধরে চলে আসা গতানুগতিক ও সমসাময়িক পরিস্থিতির অনুপযোগী ব্যাখ্যার মোটা আস্তরণ থেকে এগুলোকে বের করে আনতে হবে। এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে একটি নতুন ফিকহশাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটবে। এটা অবশ্যই ইসলামের দুই প্রধান উৎস তথা, কুরআন মাজীদ ও নবিজির জীবন-পদ্ধতিকে মেনে চলবে। সাথে সাথে বর্তমান সময়ের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবে। ঠিক যেভাবে ফিকহের প্রাচীন নথিপত্র সমসাময়িক প্রয়োজন এবং তৎকালীন জীবনবোধ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল, যখন এরিস্টোটেলিয়ান এবং নিও-প্লেটোনিক দর্শনের প্রভাব ছিল তুঙ্গে।

আমরা যদি আমাদের হারানো আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে পারি, তবে আবারও এগোতে পারব সম্মুখ পানে। কিন্তু এই লক্ষ্য পর্যন্ত আমরা ততদিন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব না, যতদিন আমরা আমাদের সামাজ-কাঠামোকে বিপন্ন করা থেকে ফিরে না-আসব এবং বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ বাদ না-দেব। বিদেশী কিন্তু স্রেফ ঐতিহাসিক কিংবা ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, চিন্তাধারার দিক থেকেও। কুরআনের আয়াত আমাদেরকে সে পথ বাতলে দিয়েছে :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

"আসলে তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে একটি উত্তম আদর্শ—এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে কিনা আল্লাহ ও শেষ-দিবসের প্রতি আশা রাখে।" [সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১]

আমাদের দ্বীন ও সমাজ ধ্বংসকারী বহিরাগত প্রবল জলধারাকে কেউই থামানোর চেষ্টা করছি না। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক শিক্ষাকে ছুড়ে ফেলেছি, দুনিয়ার সামনে তা খোলাসা করিনি। আমরা আমাদের ঈমানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি, অথচ আমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে তা ছিল বেঁচে থাকার প্রেরণা। আমরা (দ্বীন নিয়ে) লজ্জাবোধ করি, কিন্তু তাঁরা গর্ববোধ করতেন। আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর ও আত্ম-কেন্দ্রিক, আর তাঁরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন পুরো দুনিয়ার জন্য। তাঁরা ছিলেন পূর্ণতার অধিকারী, আর আমরা অন্তঃসারশূন্য।

মুসলিমরা আজ যে-সমস্যার সম্মুখীন, তার সাথে তুলনা দেওয়া যায় একজন মুসাফিরের। যে কিনা সফর করতে করতে এমন এক রাস্তায় এসে পৌঁছেছে, যেটা আড়াআড়িভাবে চলে গিয়েছে দুইদিকে। চাইলে সে ওখানটাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এর ফলাফল হলো অনাহারে ধুকেধুকে মৃত্যু। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে যে-পথ চলে গিয়েছে, সেটা ধরেও সে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে তাকে তার অতীত জীবনটাকে চিরকালের জন্যে বিদায় জানাতে হবে। অপর পথটি চলে গিয়েছে সত্যিকার ইসলামের দিকে। সে চাইলে এটিও বেছে নিতে পারে। কিন্তু এই পথ শুধু তাদেরকেই আহ্বান করে, যারা নিজেদের অতীতে বিশ্বাসী। পাশাপাশি সেই অতীতকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতে রূপান্তর করতে চায়।

শিকদার ম্যানশন
১২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুঠোফোন: ০১৮৮৮৭১৭১২৯